বিপ্লবী চীন

সুধাংশু দাশগুপ্ত

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চাটুর্জ্জি স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক

সুরেন দত্ত

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

১৯৪৪

দাম এক টাকা

প্রিণ্টার :—

শ্রীকিশোরীমোহন নন্দী,

গুপ্ত প্রেশ,

৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন,

কলিকাতা

সূচী

পাণ্ডা, তারা গণতন্ত্রের বিশেষ ধার ধারে না, এক রকম ফাশিস্ট-ঘেঁষা কেতায় দলের হুকুমৎ তারা বজায় রেখেছে। সুনইয়াৎসেনের নাম অবশ্য তারা প্রতি মুহূর্ত্তেই একবার উচ্চারণ ক'রে নিজেদের শুদ্ধ করে নেয়, কিন্তু গণতন্ত্র তাদের ধাতে সয় না।

এই কারণেই কুয়োমিনটাঙ্কে জাতীয় ঐক্যনীতি গ্রহণ করাবার জন্য কমিউনিস্টদের ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত নানাভাবে অবিরাম আন্দোলন চালাতে হয়েছিল। এই কারণেই জাতীয় ঐক্য নামমাত্র স্থাপিত হলেও কমিউনিস্ট এলাকাগুলো এই সেদিন পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল, বাইরে থেকে পাঠানো সাহায্যের তিনাংশও কমিউনিস্টরা পায় নি, মাছের তেলে মাছভাজার মত জাপানীদের মেরে তাদেরই কাছ থেকে কেড়ে-নেওয়া হাতিয়ার নিয়ে চীনের লালফৌজ এতদিন লড়ে এসেছে। এই কারণেই থেকে থেকে কমিউনিস্টদের সঙ্গে কুয়োমিন্টাঙ একটা-না-একটা গোলযোগ বাধাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থেকেছে

কিন্তু দেশপ্রেম যাদের সব চেয়ে জলন্ত, তারাই হল চীনের কমিউনিস্ট। তাই অত্যাচার, অবিচার অগ্রাহ্য করে তারা জাতীয় ঐক্য বজায় রাখ্‌বেই। তাদেরই চেষ্টার ফলে সম্প্রতি খবর এসেছে যে কুয়োমিন্টাঙ বুঝি কমিউনিস্ট এলাকাগুলো মেনে নিচ্ছে আর খানিকটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে। ফাশিজ্‌মের বিষদাঁত চূর্ণ করার জন্য চীনের জনগণের অটল, অচল আগ্রহ রয়েছে, দুর্দ্দম বিক্রম নিয়ে লড়বার প্রতিজ্ঞা তারা ভুলবে না। এ কথা সব চেয়ে ভালো করে জানে চীনের কমিউনিস্টরা, কারণ তারা জলের মধ্যে মাছের মত জনগণের মধ্যে সহজ, নিঃশঙ্কভাবে বাস করে, সাধারণ লোকের স্বদেশপ্রেমের বনিয়াদের উপর জাতীয় ঐক্যের গৌরবমণ্ডিত সৌধ তাই তারা রচনা করতে পেরেছে।

বিপ্লবী চীন ফাশিস্ট বর্ব্বরতার অবসান ঘটিয়ে প্রাচ্যের সর্ব্বত্র নতুন যুগ প্রবর্ত্তন করবে। তাই "বিপ্লবী চীন" সম্পর্কে জ্ঞানসঞ্চয় ভারতের দেশভক্তদের পক্ষে এত প্রয়োজন।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

কমরেড সুধাংশু দাশগুপ্তের লেখা "বিপ্লবী চীন" যে পাঠকসমাজে সমাদর পেয়েছে, এ-বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হল তার প্রমাণ।

হরেকরকম আইনকানুনের চাপে আজকাল কোন একটা বই বার করা একটা রীতিমত দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও "বিপ্লবী চীনের" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা যে হয়েছে এটা আনন্দের কথা। আজকের দিনে যে দুটো দেশের কাছ থেকে দুনিয়ার লোক আদর্শ ও অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করছে, যে দুটো দেশের দিকে তাকিয়ে বর্ত্তমানের ঘনান্ধকারে আশা না হারিয়ে পর্ব্বত-প্রমাণ বাধাকেও কাটিয়ে ওঠার ভরসা আমরা পাচ্ছি, সে দুটো দেশ হল সোভিয়েট আর চীন। তাই আইনের বেড়াজালে চীন সম্বন্ধে ভালো বই ছাপা আটকে পড়লে আমাদেরই লোকসান হত।

বিপ্লবী চীনের কাহিনী হল সত্যই যেন একটা আধুনিক মহাকাব্যের বিষয়-বস্তু। অকথ্য অত্যাচার অগ্রাহ্য করে, বহুযুগের সঞ্চিত দৌর্ব্বল্যকে দূরে পরিহার করে, ঘরের শত্রু হাজার বিভীষণের মন্ত্রণা কানে না তুলে, প্রায় নিরস্ত্র হয়েও চীনবাসীরা স্বদেশরক্ষার জন্য প্রতিরোধের বিরাট অটল প্রাচীর খাড়া করে সারা দুনিয়াকে অবাক করে দিয়েছে। আর এই নতুন মহাকাব্যের যারা নায়কনায়িকা, তারা হল সাধারণ মানুষ, কুলগরিমার কবচ তাদের বিপদ থেকে পরিত্রাণের ভরসা কখনও দেয় নি। তারা হল চীনের মজুর, চীনের চাষী, চীনের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী। জীবন যাদের যুগ যুগ ধরে কেবলই বঞ্চিত করে রেখেছে, তারাই সে-দেশে অসাধ্য সাধনের ব্রত গ্রহণ করেছে, জন্মভূমিতে মুক্ত স্বাধীন জীবনের জয়পতাকা উড্ডীন রাখার জন্য অম্লান মুখে প্রাণপাত করে চলেছে।

লেখক চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাসের একটা বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। কেমন করে চীনে জাতীয় ঐক্য গঠিত হয়েছিল, ঐক্যের পথে কত বাধা ছিল এবং এখনও রয়েছে, কত অত্যাচার, কত চক্রান্ত, কত কুৎসাকে দেশপ্রেমের জোরে বিকল করে দিয়ে চীনা কমিউনিস্টরা এ বিরাট ঐক্য স্থাপনে অগ্রণী

হয়েছিল এবং আজও সে-ঐক্যকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিজ্ঞা নিয়ে অনলসভাবে কাজ করে চলেছে, তার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন। জাতীয় ঐক্যের জন্য কি অক্লান্ত সংগ্রাম যে প্রয়োজন হয়, তা হয়তো আমাদের দেশে অনেকেরই জানা নেই।

ঐক্যের সংগ্রামে শৈথিল্যের কোন স্থান থাকে না। তাই আজও আগেরই মত অক্লান্ত দেশপ্রেম নিয়ে চীনা কমিউনিস্টরা জাতীয় ঐক্যনীতির বহুরূপী বৈরীদের সহস্র কৌশলকে বিফল করার জন্য সংগ্রাম করছে। ঐক্যের পথে যে অন্তরায় আজও রয়েছে, কমরেড সুধাংশু তার বর্ণনা দিয়েছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আভাস দিয়েছেন যে জনশক্তি সত্যই একবার জাগ্রত হলে সকল বাধা-বিপত্তিই অতিক্রম করা চলে।

গত বৎসর মস্কো-সম্মেলনে বৃটিশ, আমেরিকান ও চীনা রাষ্ট্রনেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ফাশিস্ট জাপান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ যতদিন না করে, ততদিন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হবে। জাপানী ফাশিস্টরা সুযোগ বুঝে কেবলই শান্তির ফানুস উড়িয়ে চীনের জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় লাগে। চীনদেশে সর্ব্বেসর্ব্বা কুয়োমিনটাঙ দলের অনেক মাতব্বর আছে যারা জাপানের সঙ্গে লড়ার চেয়ে কমিউনিস্টদের দলন করাকেই জরুরী মনে করে। নানকিং শহরে জাপানীরা ওয়াং-চিং-ওয়াইকে শিখণ্ডী সাজিয়ে রেখেছে, গোটা চীনকে ছলে বলে কৌশলে পদানত করার কত প্রচেষ্টা করে চলেছে। মস্কো-সম্মেলনের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব তাই খুবই বেশী।

পূর্ব্ব এশিয়ার বহু দেশ আজ ফাশিস্ট জাপান গ্রাস করে বসেছে। বার্মা রোড এখনও মিত্রপক্ষের নাগালের বাইরে। বিমানপথে চীনে অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি পাঠানো হয় বটে, কিন্তু ঐ সাহায্যের নমুনা এখনও পর্য্যন্ত একেবারেই মনোমত নয়। জোর রকমে লড়াই চালিয়ে জাপানকে বাস্তবিকই ঘায়েল না করতে পারলে চীনের যন্ত্রণা চুক্‌তে দেরী হবে, আর যে ছদ্মবেশী ফাশিস্টের দল এখনও চুংকিং-এর আনাচে-কানাচে বিচরণ করে তাদের বিভীষণবৃত্তি চালিয়ে যাওয়া সহজ হবে।

কমিউনিস্ট এলাকাগুলো ছাড়া স্বাধীন চীনের সর্ব্বত্র হল কুয়োমিণ্টাঙ-এর একচ্ছত্র আধিপত্য। চিয়াংকাইসেক থেকে আরম্ভ করে এই দলের যারা

চীনের মুক্তিসংগ্রাম ও কুয়োমিনটাঙ্

চীনের আধুনিক ইতিহাস হচ্ছে চীনের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস। উনিশ শতকের প্রারম্ভে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট চীনের দ্বার ছিল বন্ধ। আমেরিকা ও ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের তখন সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল চীনের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করা। এ-কার্য্যে অগ্রণী হয় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা। উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধেই ইংরেজ অস্ত্রের সাহায্যে চীনের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করে। পরে অন্য বিদেশীরা ইংরেজের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে কালক্ষেপ করে নি। ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মধ্যেই চীনের স্বাধীন অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায় হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী জাতির বিরোধী স্বার্থ ও দেশবাসীর মুক্তিপ্রয়াস চীনকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচায়। চীনের মুক্তি-আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় ১৮৯৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধের অবসানের পর। অবশ্য এর পূর্ব্বে সময় সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুপ্ত সমিতি মাঞ্চুশাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। সে-রকম বিদ্রোহের মধ্যে হুঙ-সিউচুয়েন এর নেতৃত্বে তেইপিং বিদ্রোহ-ই (১৮৫০-১৮৬৪) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা ও বৃটিশ স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী ও বিদেশী অস্ত্রের সাহায্যে মাঞ্চুশাসক-সম্প্রদায় এ-বিদ্রোহ প্রশমিত করে। কিন্তু চীনের স্বাধীনতা-আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয় ১৮৯৪ থেকে ১৯০৪ সালের ভিতর। সুদূর প্রাচ্যের এই দশ বৎসরের ইতিহাস ইউরোপ ও আমেরিকার দ্বারা চীনদেশ লুণ্ঠনের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ১৮৯৪-এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার ধনিক প্রভুরা চুক্তিপত্রের দৌলতে চীনের বাজার অধিকার করে বসেছিল। চীন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৪) চীনের পরাজয়ে যখন চীনের দুর্ব্বলতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তখন বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, রুশিয়া চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। তাদের পরিকল্পনা ছিল আফ্রিকার ন্যায় চীনকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করা। কিন্তু বিভিন্ন জাতির বিরোধী স্বার্থের সংঘাত, চীনে আমেরিকার মুক্তদ্বার-নীতির ঘোষণা ও জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের অভ্যুত্থানের ফলে সে-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্ভব হয়নি।

১৮৯৪ সাল থেকে ১৯০৪ সালের ভিতর সুদূর প্রাচ্যে তিনটি যুদ্ধ আমাদের চোখে পড়ে—১৮৯৪ সালের চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৯০০ সালের বক্সার বিদ্রোহ, ১৯০৪ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ। এই তিনটি যুদ্ধের ফলে চীনে বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্রের শোষণের শৃঙ্খল অধিকতর সুদৃঢ় হয়। কিন্তু ইতিহাসের গতি-ধারায় দেখা যায় যে অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণই বিদ্রোহ ও বিপ্লবের বীজ বপন করে—চীনেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। ১৮৯৪ থেকে ১৯০৪—এই দশ বৎসরের ভিতর চীনে বিপ্লব-আন্দোলন প্রকট হয়ে ওঠে। নির্ব্বিচার বিপ্লবোচ্ছ্বাসে বিপ্লব-আন্দোলন কোন দিনই জয়যুক্ত হয় না; বিপ্লব-আন্দোলনকে জয়যুক্ত করতে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন স্থান কাল অনুসারে সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি। এ-কর্ম্মপদ্ধতি রচনা করে বিপ্লবী দল বা পার্টি। পার্টিই বিপ্লবকে ঠিক পথে পরিচালিত করে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। চীনে সর্ব্বপ্রথম এই পার্টি স্থাপিত হয় ১৮৯৪ সালে সুন্‌ইয়াৎসেনের চেষ্টায়। চীন-জাপান যুদ্ধের সময় সুনইয়াৎসেন আমেরিকা-অধিকৃত হনোলুলুতে গিয়ে সেখানকার চীনা বণিকদের একত্রিত করে চীনের প্রথম বিপ্লবী দল গঠন করেন। এই পার্টির নাম ছিল "সিঙ্‌ চুঙ্‌ হুই" ;এর লক্ষ্য ছিল মাঞ্চুশাসনের উচ্ছেদ সাধন ক'রে সামন্ততান্ত্রিক চীনকে গণতান্ত্রিক চীনে পরিণত করা। সাগর-পারের চীনা বণিক ও চীনা ছাত্রদল ছিল এই পার্টির প্রধান উদ্যোক্তা। এই পার্টির প্রধান কাজ ছিল চীনবাসীর ভিতর বিপ্লবের বাণী প্রচার। তবে তাদের কার্য্যাবলী শুধু বিপ্লবের বাণী প্রচারেই নিবদ্ধ ছিল না। ১৮৯৫ সালে সুনইয়াৎসেন হংকং থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি ক'রে ক্যান্টনে সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর এই বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। ১৯০০-এ সুনইয়াৎসেনের সহকর্ম্মীরা পুনরায় ওয়েইচাও, হুনান প্রভৃতি স্থানে সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা করেন, কিন্তু পূর্ব্বেকার ন্যায় এ-অভিযানও বিফল হয়।

এই রকম সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্টার ফলে চীনের জনসাধারণ বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে; তাদের তন্দ্রালস ভাব কেটে যায় এবং তারা দলে দলে "সিঙ্‌ চুঙ্‌ হুই"তে যোগদান করে। ১৯০৫ সালে জাপানের

রাষ্ট্রকেন্দ্র টোকিও শহরে এক কনফারেন্সে "সিঙ চুঙ হুই" ও চীনের অন্যান্য বিপ্লবী সমিতিগুলিকে একত্রীভূত করে সুনইয়াৎসেন "টুঙ্‌মিঙ হুই" নামে এক জাতীয় বিপ্লবী দলের প্রতিষ্ঠা করেন। "টুঙ মিঙ হুই"-এর উদ্দেশ্য ছিল মাঞ্চু-শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন ক'রে চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, চীনের সমস্ত জমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিবর্তিত করা, বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা এবং চীন ও জাপানের ভিতর বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করা।

"টুঙ্‌মিঙ হুই"-এর আপ্রাণ চেষ্টায় ও উচাঙ-এর সৈন্যদের বিদ্রোহে ১৯১১ সালে চীনে প্রথম বিপ্লব ঘটে। মাঞ্চুশাসনতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং সাধারণতন্ত্রের সংস্থাপন চীনের নবজন্মের সূচনা করে। সুনইয়াৎসেন চীন রিপাব্লিকের প্রথম সভাপতি হন। তখন চীনের জাতীয় বিপ্লবী দলের নাম "টুঙ মিঙ হুই" থেকে পরিবর্তন করে "কুয়োমিন্‌টাঙ্‌" রাখা হয়। কিন্তু সে-সময় দেশে শান্তি স্থাপন, ও জাতীয় বিপ্লবী শক্তিকে সুসংবদ্ধ করে চীনে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করবার সামর্থ্য কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর ছিল না। অন্যদিকে বিপ্লবের বাণী ব্যাপকভাবে চীনের জনগণের ভিতর তখনও গিয়ে পৌছায় নি; বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত চীন যুবকদের ভিতরই বিপ্লবের বাণী সীমাবদ্ধ ছিল। তাই সুনইয়াৎসেন রিপাব্লিকের সভাপতিপদ ত্যাগ করে মাঞ্চুশাসকের সমর্থক ইউয়ান-শি-কাই-কে চীন রিপাব্লিকের সভাপতি বলে ঘোষণা করেন। সুনইয়াৎসেনের আশা ছিল যে, ইউয়ান-শি-কাইকে রাষ্ট্রপতি ব'লে ঘোষণা করলে দেশের ভিতর সর্ব্বদলের সমর্থন তিনি পাবেন এবং সে-সুযোগে ধীরে ধীরে বিপ্লবান্দোলনকে জয়যুক্ত করে তুলবেন। স্বার্থসিদ্ধিকল্পে রাষ্ট্রপতি ইউয়ান-শি-কাই প্রথমে গণতন্ত্রের সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাঁর কল্যাণে চীনে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব সমানই থেকে যায়, জনগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুনইয়াৎসেন দেখলেন যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচারে তিনি ভুল করেছেন, ইউয়ান-শি-কাই-এর পতন না ঘটালে চীনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাই ১৯১৩ সালে সুনইয়াৎসেনের নেতৃত্বে কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ ইউয়ান-শি কাই-এর উচ্ছেদ সাধনের জন্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ

করে ; চীনের ইতিহাসে এই বিপ্লব গ্রীষ্ম-বিপ্লব নামে খ্যাত। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ইউয়ান-শি কাই পূর্ব্বেই কুয়োমিন্‌টাঙ্‌কে বে-আইনী ঘোষণা করে এ-বিপ্লবের অবসান ঘটান। ১৯১৪ সালে কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর নাম পরিবর্ত্তন করে চীনের বিপ্লবী পার্টি রাখা হয়। জনসাধারণের ভিতর বিপ্লবের বাণী প্রচার করাই ছিল এই পার্টির প্রধান কাজ। ইউয়ান-শি-কাই এই পার্টির কার্য্যাবলীর প্রতিরোধ-কল্পে "চু আন হুই" নামে এক প্রতিক্রিয়াশীল সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে দেশের বিপ্লবী শক্তিকে সঙ্কুচিত করবার জন্যে জাপানের একুশ দফা দাবীর (১৯১৫) চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ক'রে ইউয়ান-শি-কাই জাপানের সাহায্য গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। জাপানের ঐ একুশটি দাবী পূর্ণ হ'লে চীন নিশ্চয়ই জাপানের পদানত আশ্রিত রাজ্য হয়ে পড়ত। বাধা এল স্বভাবতই আমেরিকার দিক থেকে। ইতিমধ্যে ইউয়ান-শি-কাই নিজেকে চীনের সম্রাট বলে ঘোষণা করবার সঙ্কল্প করেন. অবশ্য এ-সঙ্কল্প শেষ পর্য্যন্ত সফল হ'তে পারেনি য়ুনান প্রদেশের বিপ্লবীদের চেষ্টায়। য়ুনান ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের চীনবাসীরা ইউয়ান-শি-কাই-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সে-বিদ্রোহকে প্রশমিত করবার জন্যে ইউয়ান-শি-কাই তাঁর সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাতে তাঁর দুর্ব্বলতাই প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে এবং সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ ক'রে বিপ্লবীরা তাদের আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলে। ইউয়ান-শি-কাই-এর উচ্ছেদ সাধনই তাদের লক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে ইউয়ান-শি-কাই-এর হঠাৎ মৃত্যুতে বিপ্লবীদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার পথ সুগম হয় ; কিন্তু এই সুগম পথ (বিপ্লবকে জয়যুক্ত করবার জন্যে) ব্যবহার করবার উপযোগী শক্তি-সামর্থ্য বিপ্লবীদের তখন ছিল না। চীনের বিপ্লবী পার্টি তখনও সুসংবদ্ধ হয়নি, অগ্রসর হয়ে রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করবার মত অবস্থায় বিপ্লবী পার্টি তখনও এসে পৌঁছায়নি। সুতরাং রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্বভার সৈনিকদের হাতে গিয়ে পড়েছিল। আবার সৈনিকদের ভিতরও একতা ছিল না। ইউয়ান-শি-কাই-এর অনুচর তুয়ান-চি-হুই রাষ্ট্রে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ফেঙ ফুয়োচাঙ-এর নেতৃত্বে একদল সৈনিক তার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করে ; মাঞ্চুরিয়ায় চাঙ সোলিন নিজের

আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়। সংক্ষেপে দেশে বিভিন্ন সেনানায়ক কর্তৃক শাসিত খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব চীনকে এ-সময় দুর্ব্বল করে ফেলে।

চীনের জাতীয় জীবনের এ-দুর্দ্দিনে রুশ বিপ্লবের বাণী চীনে এসে পৌছায়। ১৯১৮-এ স্নুন্‌ইয়াৎসেন সাংহাই থেকে আমেরিকা-প্রবাসী চীনাদের মারফৎ রুশবিপ্লবের নেতা লেনিনকে অভিনন্দন ক'রে এক তার পাঠান। স্নুন্‌ইয়াৎসেনের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা ক'রে চীনের বিপ্লব-আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করা। ১৯২১-এ সোভিয়েট রাশিয়া স্নুনইয়াৎসেনের নিকট একজন প্রতিনিধি পাঠায়; এই প্রতিনিধি প্রেরণের মূলে ছিল স্নুন্‌ইয়াৎসেনকে সোভিয়েট রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেওয়া। ১৯২২-এ চীনের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্যে রুশ প্রতিনিধি এডলফ জফ রাশিয়া থেকে চীনে আসেন। ১৯২৩-এ সাংহাই থেকে মৈত্রী স্থাপন সম্বন্ধে জফ ও স্নুনইয়াৎসেনের এক যুগ্মবার্ত্তা প্রচারিত হয়। এ-সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা আরো অনেক দূর অগ্রসর হয় টোকিওতে জফ ও কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর প্রতিনিধি লিয়াও চুঙ কাই-এর ভিতর। ১৯২৩-এ স্নুনইয়াৎসেন সোভিয়েট রাশিয়ায় লালফৌজের সংগঠনপ্রণালী ও যুদ্ধের কৌশল সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জ্জনের জন্যে চিয়াং কাইসেককে রাশিয়ায় পাঠান। ঐ বৎসরই স্নুনইয়াৎসেন ও কুয়োমিন্‌টাঙ্‌কে সাহায্য করবার জন্যে বরোদিন রাশিয়া থেকে চীনে আসেন। "বরোদিনে"র আগমন চীনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯২৫-এ বরোদিনের পরামর্শানুযায়ী স্নুনইয়াৎসেন রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির অদর্শে কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর সংস্কার করেন। পার্টির নাম আবার চীনের কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ রাখা হয়।

১৯১১ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত চীনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে চীনের বিপ্লবী পার্টির দোষগুলি সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। প্রথমত সম্পূর্ণভাবে একজন ব্যক্তির উপর নির্ভর ক'রে এই পার্টি গড়ে উঠেছিল। পার্টির সভ্যরা পার্টির নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ না ক'রে পার্টির নেতা স্নুনইয়াৎসেনের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতো—অবশ্য চীনের তৎকালীন অবস্থায় ১৯১১ সালের

বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ-প্রথার সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা ছিল; কিন্তু তারপর বস্তুত এর কোন সার্থকতা ছিল না। দ্বিতীয়ত ১৯১১ সালের বিপ্লবের পর অনেক ক্ষেত্রে সৈন্যদের উপর, বিশেষ করে সেনানায়কদের উপর পার্টিকে নির্ভর করতে হয়েছে। বলশেভিকদের লালফৌজের ন্যায় চীনের বিপ্লবী পার্টির নিজস্ব কোন বাহিনী ছিল না। তৃতীয়ত পার্টির প্রচার-বিভাগের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় নি; তার প্রধান কারণ, বলশেভিকদের "প্রাভ্দা"র ন্যায় কোন মুখপত্র পার্টির ছিল না। চতুর্থত পার্টির অভ্যন্তরে শৃঙ্খলার অভাব। বরোদিন যখন চীনে এসে কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তখন পার্টির ঐ দোষগুলি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুনইয়াৎসেনও ঐগুলি লক্ষ্য করেছিলেন। তাই ১৯২৪ সালে বরোদিনের পরামর্শ গ্রহণ করে বলশেভিক পার্টির অনুকরণে তিনি কুয়োমিন্টাঙ্-এর আদ্যোপান্ত সংস্কার করেন। তবে আদর্শের দিক থেকে সুনইয়াৎসেন মার্ক্স্-বাদকে গ্রহণ করতে পারেন নি। নিজের মৌলিকত্ব বজায় রাখতে গিয়ে তিনি মার্ক্স্বাদকে অনেক স্থানে আক্রমণ করেছিলেন—বিশেষ করে মার্ক্সের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে। প্রকৃতপক্ষে সুনইয়াৎসেন ছিলেন র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়া, হেন্‌রি জর্জের মতানুবর্ত্তী। সুনইয়াৎসেনের মতবাদ তাঁর সান্‌মিন্ নীতির তিন প্রস্তাবে খ্যাতি লাভ করেছে। এই তিন প্রস্তাব হচ্ছে—পূর্ণ স্বরাজ, গণতন্ত্র এবং জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি। কিন্তু আদর্শের এ-পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও চীনের বিপ্লবকে সার্থক করে তুলবার জন্যে বারোদিন ছিলেন সুনইয়াৎ-সেনের প্রধান পরামর্শদাতা। চীনে বিপ্লবান্দোলনে বরোদিনের স্থান কোথায়? এ-প্রশ্নের উত্তর সুনইয়াৎসেনের কথায়, "বরোদিনের নাম হচ্ছে লাফেইয়েৎ।" (অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে থেকে গিয়ে আমেরিকান বিপ্লবীদের বিপ্লবান্দোলন জয়যুক্ত করতে লাফেইয়েৎ যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।)

কুয়োমিন্টাঙ্-এর পুনর্গঠনের সময় চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কুয়ো-মিন্টাঙ্-এর ঐক্য স্থাপন সুনইয়াৎসেনের অক্ষয় কীর্ত্তি। আমেরিকা ও ইউরোপের ধনিকগোষ্ঠির স্বত্ব চীনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরই চেষ্টায়—অবশ্য চীনকে শোষণ করবার জন্যে—রেল-লাইন, ফ্যাক্টরী, ডক প্রভৃতিও স্থাপিত হয়।

আবার রেল-লাইন, ফ্যাক্টরী, ডক প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গেই চীনে প্রোলেটারিয়েট-দের আবির্ভাব দেখা দিল এবং ধীরে ধীরে চীনের প্রোলেটারিয়েটদের পার্টি'র উদয় হ'ল। ১৯২০ সালে পিকিং-এর নিকটবর্ত্তী চাঙ্‌শিনটিয়েতে পিকিং-হ্যাঙকাউ রেল-ধর্ম্মঘটের সময় চীনের কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন হয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্য ছিল সামন্ততন্ত্রের ও বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন ক'রে চীনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রবর্ত্তন করা; কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর উদ্দেশ্য ছিল সামন্ততন্ত্র ও বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন ক'রে চীনে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভিতর ঐক্য স্থাপন খুব সহজেই হয়েছিল স্থনইয়াৎসেন ও কমিউনিস্ট নেতা লি-তা-চাও-এর চেষ্টায়। ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ এই কয়েক বৎসর চীনের জাতীয় দল কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একত্র হ'য়ে বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্র আর তার চীনা অনুচরদের বিরুদ্ধে বিরাট সংগ্রাম চালিয়েছিল—চীনের ইতিহাসে এই বিপ্লব "তাকেহমিঙ" নামে খ্যাত। গণশক্তির এই ঐক্য প্রারম্ভ থেকে চীনা বুর্জোয়াদের মনঃপূত হয় নি এবং গণশক্তির সাফল্য দেখে তারা শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। তাই তাদের প্রতিনিধি প্রধান সেনাপতি চিয়াং-কাইসেক এই ঐক্য ভেঙ্গে দেবার জন্যে সচেষ্ট হন। ১৯২৬ সালে ক্যাণ্টনে সামরিক আইন জারী করে ক্যাণ্টনের সমস্ত কমিউনিস্টদের তিনি গ্রেফ্‌তার করেন—অবশ্য বরোদিনের চেষ্টায় এ-যাত্রা কমিউনিস্টরা মুক্তি পায়। কিন্তু চিয়াং-কাইসেকের আসল স্বরূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়ে ১৯২৭ সালে। ঐ বৎসর চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থীরা উহানস্থিত কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নানকিং শহরে এক নতুন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। উহানে কিন্তু কমিউনিস্টদের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কমিউনিস্টদের এই প্রভাব বৃদ্ধি দেখে বহু বামপন্থী কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ সভ্যেরাও বিচলিত হ'য়ে পড়ে। এই সময়ে বামপন্থীদের নেতা ওয়াংচিংওয়াইকে (বর্ত্তমানে ইনি চীনে জাপানীদের আশ্রিত গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তা) কমিনটার্নের প্রতিনিধি মানবেন্দ্রনাথ রায় (বর্ত্তমানে ইনি ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রধান সমর্থক) চাষীদের

ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধে মস্কো থেকে প্রেরিত একটি গোপনীয় তার বিনানুমতিতে দেখানোর ফলে তাদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের বিচ্ছেদ আর রোধ করা গেল না।

চিয়াংকাইসেক সুযোগ বুঝে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তাঁর নিষ্ঠুর আন্দোলন আরম্ভ করে দেন। ১৯২৭-এর জুলাইতে কুয়োমিন্টাঙ্ থেকে কমিউনিস্টদের বিতাড়িত করা হয়, এইভাবে ১৯২৭-এ চীনের বিপ্লবান্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬ পর্য্যন্ত চীনের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস হচ্ছে কমিউনিস্ট-দলনের ইতিহাস। আজ চীনে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের যে-ধ্বংসলীলা আমাদের চোখে পড়ে, তা জাপানীদের চিয়াংকাইসেকের কাছ থেকে শেখা। ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে গ্রামের পর গ্রামকে শ্মশানে পরিণত করা—এই পোড়া মাটি-র নীতি চিয়াংকাইসেক কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। জাপানীরা সেই নীতিই চিয়াংকাইসেকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, চীনা কমিউনিস্টদের দৃঢ়তা ও কঠোর সঙ্কল্প। চিয়াংকাইসেকের শত অত্যাচার-উৎপীড়ন তাদের পথভ্রষ্ট করতে পারেনি। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬—এই সুদীর্ঘ দশ বৎসর চিনের এক-চতুর্থাংশে কমিউনিস্টরা রক্তপতাকা উঁচু করে রেখেছে; সোভিয়েট চীন নামে সে-অঞ্চল খ্যাত। ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালিয়েও সাম্যবাদী চীনকে চিয়াংকাইসেক জয় করতে পারেন নি। পরিশেষে সেই কমিউনিস্টদের সঙ্গেই আবার চিয়াংকাইসেক ঐক্য স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছেন।

চীনের মুক্তিসংগ্রাম ও কুঙ্‌চান্‌টাঙ্‌

বিংশ শতাব্দীর চীনের ইতিহাসকে বিপ্লবের ইতিহাস আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত নয়—বিপ্লবের পথেই বিংশ শতাব্দীর চীনের অগ্রগতি। চীনে প্রথম বিপ্লব সংঘটিত হয় ১৯১১ সালে, এর ফলেই চীন রিপাব্লিকের অভ্যুত্থান। দ্বিতীয় বিপ্লব পরিচালিত হয় বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্র আর তার চীনা অনুচরদের বিরুদ্ধে। সে-বিপ্লব ঘটে ১৯২৫ থেকে ১৯২৭-এর ভিতর কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ ও "কুঙ্‌চান্‌টাঙ্‌"-এর (চীনের কমিউনিস্ট পার্টি) সম্মিলিত চেষ্টায়। তৃতীয় বিপ্লবের আরম্ভ ১৯২৭-এর পর; এ-বিপ্লবে কুঙচানটাঙ চীনের বুকে রক্তপতাকা উড়িয়ে চীনের এক-চতুর্থাংশে সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। চতুর্থ বিপ্লব ঘটে ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সিয়ানফু্‌'তে; ফলে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ ও কুঙ্‌চান্‌টাঙ্‌-এর ভিতর আবার ঐক্য স্থাপিত হয়।

চীনে প্রথম বিপ্লবের পর সাধারণতন্ত্র সংস্থাপন (১৯১১) নবজন্মের প্রতীক-রূপে বোধ হ'লেও চীনের ন্যায় বিরাট দেশে আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপযোগী শক্তি-সামর্থ্য চীনের বিপ্লবীদের তখন ছিল না। মাঞ্চুরাজবংশের পতনের পর রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্বভার নিয়ে এক প্রবল অরাজকতা দেশের সর্ব্বত্র আত্মপ্রকাশ করে। এ-অরাজকতার ভিতরও বিপ্লবের বাণী চীনের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে—বিশেষ ক'রে চীনা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। ভাবধারার দিক থেকে চীন সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। নব নব চিন্তাধারা, নতুন নতুন রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে চীনে ছোট ছোট শিক্ষা-সমিতির আবির্ভাব এই সময়ে লক্ষ্য করবার বিষয়। এই সমিতিগুলিই ধীরে ধীরে কমিউনিজ্‌ম্‌ প্রচারের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ১৯১৭ সালে মাওৎসেতুঙ-এর চেষ্টায় চাঙ্‌সাতে "সিন মিন সুয়ে হুই"র প্রতিষ্ঠা হয়; র‍্যাডিকাল ভাবধারার প্রচারই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। মাওৎসেতুঙ তখনও নিজেকে কমিউনিস্ট ব'লে ঘোষণা করেন নি। এই সমিতির অধিক সংখ্যক সভ্যই পরে কমিউনিস্ট মতাবলম্বী হ'য়ে চীনে কমিউনিস্ট আন্দোলন জয়যুক্ত

করতে আত্মনিয়োগ করে।—এর মধ্যে লোমান্, সিয়াসি, হোসিয়েন-হোন, কুয়োলিয়াঙ, সিয়াওচুচাঙ, সাইহোসেঙের নাম-ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ বৎসরই হুপেতে সিন মিন্ সুয়েহুই-এর ন্যায় আর একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় ;—এই সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা ওয়েনতেই ইঙ, লিন-পি-আও পরে নিজেদের কমিউনিস্ট ব'লে ঘোষণা করেন। পিকিং শহরে "ফুসিয়ে" নামে একটি সমিতি গড়ে ওঠে—এর অনেক সভ্য কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। সে-সময়ে সাংহাই, হ্যাঙচাও, হ্যাঙ্কাই, তিয়েনসিন প্রভৃতি শহরগুলিতেও অনুরূপে র‍্যাডিকাল সমিতির আবির্ভাব রাষ্ট্রনেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিয়েন-সিনের সমিতির নাম ছিল "চু-উসুয়ে হুই"-এর প্রতিষ্ঠাতা পরবর্ত্তী যুগের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা চু-এন-লাই ও মিস তেঙইঙ-চাও (বর্ত্তমানে ইনি মিসেস্ চু-এন্-লাই ব'লে পরিচিতা)। কমিউনিস্ট নেতা চেন-তু-সিউ সম্পাদিত "সিন্ চিঙনিয়েন" পত্রিকা এই সমিতিগুলির প্রেরণা ছিল। তাদের প্রচার-কার্য্যের ফলে চীনের চিন্তাজগতে কমিউনিজ্‌মের প্রসার বিস্তৃতি লাভ করেছিল। অন্যদিকে বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্র আর তার চীনা অনুচরদের শোষণের ফলে চীনের নিপীড়িত জনগণের ভিতর দিন দিন শ্রেণী-চেতনা জাগ্রত হ'তে থাকে। এ সময়েই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, কুঙচানটাঙ-এর প্রতিষ্ঠা হয় (১৯২০)।

রুশ বিপ্লবের পর লেনিন যখন কমিনটার্নের প্রতিষ্ঠা করেন, চীনে তখন শুধু কমিউনিজমের গোড়াপত্তন হয়েছিল। ১৯১৯ সালের প্রথম দিকে চেন-তু-সিউ কমিনটার্নের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ১৯২০ সালে কমিনটার্নের প্রতিনিধি মারলিন সাংহাইতে আসেন। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন ক'রে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা। এর কিছু কাল পরে চেন-তু-সিউ সাংহাইতে কমিউনিস্টদের এক কনফারেন্স ডাকেন। সে-সময় ইউরোপে প্যারিস নগরীতে চীনা ছাত্রদলও এক সভায় চীনে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করবার প্রস্তাব করেছিল। অন্যদিকে ঐ বৎসরই (১৯২০) পিকিং-এর নিকটবর্ত্তী চাঙ-শিনটিয়েতে পিকিং-হ্যাঙ্কাউ রেল-ধর্ম্মঘটের সময় চীনা প্রোলে-টারিয়েটরা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপন করে। ১৯২১ সালের মে

মাসে সাংহাইতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সভা হয়। অন্যান্য কমিউনিস্ট-দের সঙ্গে পরবর্ত্তী যুগের কমিউনিস্ট নেতা মাওৎসেতুঙও এই সভায় যোগদান করে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন। এই কমিউনিস্ট পার্টিই চীনের বিপ্লবের ইতিহাসে কুঙচানটাঙ নামে খ্যাত। কুঙ-চান-টাঙ-এর সংগঠনকার্য্যে চেন-তু-সিউ ও লি-তা-চা-এর দান অশেষ। তখনকার দিনে এই দুজনই কুঙ-চান-টাঙ-এর নেতা হিসাবে চীনে পরিচিত ছিলেন। লি-তা-চাও-এর অধীনে পিকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী লাইব্রেরীয়ান হিসাবে কাজ করবার সময় মাওৎসেতুঙ্‌ কমিউনিস্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠেন, অবশ্য চেন-তু-সিউর লেখনীও মাওৎসেতুঙ-এর চিন্তাধারা সমৃদ্ধ করেছিল। কুঙচানটাঙ-এর প্রথম সভায় সর্ব্বসমেত বারজন কমিউনিস্ট যোগদান করেছিল। ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে হুনানে কুঙচানটাঙ-এর প্রথম প্রাদেশিক শাখা গঠিত হয়; মাওৎসেতুঙ এই প্রাদেশিক শাখার সভ্য হন। ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রদেশে ও শহরে কুঙচানটাঙ-এ শাখা-প্রশাখা গঠিত হ'তে আরম্ভ করে। সাংহাই পার্টির কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায় এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় চেন-তু-সিউ, চাঙ কুয়ো-তাও, চেনফ্‌ঙ-শো (বর্ত্তমানে ইনি কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর সভ্য), শিহ্‌ংসেউ-তুঙ (ইনি এখন চিয়াংকাইসেকের বেতনভোগী কর্ম্মচারী) স্থনউয়ানলু, লিহানৎসেন, নিতা-চাও ও লিস্থন'কে নিয়ে।

ইতিমধ্যে ফরাসী দেশে চু-এন-লাই, লিলি-সান, লোমান, সাইহোসেঙ ও মিস শাঙচেন-উ (ইনি পরে মিসেস সাইহোসেঙ ব'লে খ্যাতি লাভ করেন) প্রবাসী চীনা শ্রমিক ও চীনা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। জার্ম্মানীতেও প্রবাসী চীনাদের নিয়ে অনুরূপ একটি পার্টি গঠিত হয়—এর উদ্যোক্তা ছিলেন চীনের লাল ফৌজের বর্ত্তমান সেনানায়ক চু-তে, কাঙউ-হান্‌ ও চাঙশেঙফু। মস্কোতে চিউ পাই এর, জাপানে চুফু-হাই-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দু'টি শাখা খোলা হয়।

১৯২২ সালে কুঙচানটাঙ-এর দ্বিতীয় অধিবেশন হয় সাংহাইতে। পার্টির কার্য্যাবলী তখন ছাত্র ও শ্রমিকদের ভিতর দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল।

কৃষকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রচার ও সংগঠনকার্য্য তখনো ভালোভাবে আরম্ভ হয়নি। হুনান প্রদেশেই পার্টির কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছিল—সে-প্রদেশে পার্টির সেক্রেটারী ছিলেন মাওৎসেতুঙ।

কুয়োমিন্‌টাঙ-এর তৃতীয় অধিবেশন হয় ১৯২৩ সালে ক্যাণ্টনে। সামন্ত-তন্ত্র ও বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যে চীনা কমিউনিস্টদের কুয়োমিন্‌টাঙ-এর সঙ্গে একত্রিত হয়ে "সম্মিলিত ফ্রণ্ট" গঠন করবার প্রস্তাব এই অধিবেশনেরই কৃতিত্ব। এ-প্রস্তাব স্থনইয়াৎসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তিনি তখন সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে চীনের মৈত্রী স্থাপন ক'রে বরোদিনের পরামর্শ অনুযায়ী কুয়োমিন্‌টাঙ-এর সংস্কারে মনোনিবেশ করেছিলেন। তাই ১৯২৪ সালে পুনর্গঠনের পর কুয়োমিন্‌টাঙ-এর প্রথম অধিবেশনে চীনের জাতীয় দল কুয়োমিনটাঙ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কুঙচান্‌টাঙ-এর এক "সম্মিলিত ফ্রণ্ট" গঠিত হয়।

"সম্মিলিত ফ্রণ্ট" গঠনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কমিউনিস্টদের কার্য্যকলাপ শ্রমিক ও ছাত্রদের ভিতরই নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে কমিউনিস্টরা বুঝতে পারল যে সামন্ত ব্যবস্থার নিষ্পেষণে কৃষকেরা দিন দিন সচেতন হয়ে উঠেছে। হুনান প্রদেশের কৃষকদের বৈপ্লবিক চেতনাই তার প্রমাণ। কৃষকদের জাতীয় বিপ্লবান্দোলনের মধ্যে নিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হল। এ-কাজের ভার কমিউনিস্টরাই এগিয়ে এসে গ্রহণ করে। অল্প কয়েক মাসের মধ্যে মাওৎসেতুঙ তাঁর সহকর্ম্মীদের নিয়ে কুড়িটি কৃষক-সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। কমিউনিস্টদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফলে জনসাধারণ ও কুয়োমিন্‌টাঙ-এর ভিতর কমিউনিস্টদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে। কুয়োমিনটাঙ-এর বামপন্থীরা ছিল কমিউনিস্টদের প্রধান সমর্থক। কুয়োমিন্‌টাঙ-এর মুখপত্র "পলিটিক্যাল উইকলি"র সম্পাদনার ভার এসে পড়ে মাওৎসেতুঙের উপর। তা ছাড়া চীনের সমস্ত কৃষক-আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব মাওৎসেতুঙ-এর উপর কুয়োমিন্‌টাঙ-এর নেতারা ন্যস্ত করলেন। কৃষক-আন্দোলনকে শক্তিশালী করবার উদ্দেশ্যে মাওৎসেতুঙ কৃষককর্ম্মীদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং সেজন্যে একটি স্কুলও স্থাপিত হয়। চীনের একুশটি প্রদেশ থেকে, এমন কি অন্তোর্মঙ্গোলিয়া

থেকেও প্রতিনিধি এসে এই স্কুলে শিক্ষা লাভ করতে থাকে। এই সময় মাওৎসেতুঙ কুয়োমিনটাঙ-এর প্রচার-বিভাগের প্রধান কর্ত্তা হ'য়ে উঠলেন। প্রচার বিভাগ ও কৃষক-বিভাগ নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে থাকায় জনগণের ভিতর বিপ্লবের বাণী প্রচারে কমিউনিস্টদের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা ঘটে, কিন্তু নিজেদের ভিতর মতবিরোধ থাকায় সে-সুযোগ সুবিধা কমিউনিস্টরা যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় নি। কৃষক-আন্দোলন ও ভূমিস্বত্ব বিষয় সম্বন্ধে মাওৎসেতুঙ ও হুনান প্রদেশের তাঁর সহকর্ম্মীরা চরম মতবাদ পোষণ করতেন; কিন্তু কুঙচানটাঙ-এর তদানীন্তন নেতা চেন-তু-সিউ ছিলেন সে-মতবাদের বিরোধী। মাওৎসেতুঙ এই সময় তাঁর মতবাদের প্রচারকল্পে দুটি প্রবন্ধ রচনা করেন; কিন্তু চেন-তু-সিউ সে-প্রবন্ধ দুটি কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্রে প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন। মাওৎসেতুঙ-এর সে-প্রবন্ধ দুটি ক্যাণ্টনের কৃষকদের একটি মাসিক পত্রিকায় ও "চুঙকুয়ো-চিং-নিয়েন" নামে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

"সম্মিলিত ফ্রণ্ট" গঠনের পর চেন-তু-সিউ শুধু সম্মিলিত ফ্রণ্টকে যে-কোন ভাবে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কুয়োমিন্টাঙ-এর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের স্বার্থ সংরক্ষণে অনেক ক্ষেত্রে সম্মতি দিয়ে চলতে আরম্ভ করেন। কুয়োমিন্টাঙ-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৯২৬) সম্মিলিত ফ্রণ্টের ভিত্তি অধিকতর সুদৃঢ় হয়েছিল। গণশক্তির এই ঐক্য কিন্তু কুয়োমিন্টাঙ-এর দক্ষিণপন্থীদের মনঃপূত হয় নি; একে ভেঙে দেবার জন্যে তারা সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিল। সুনইয়াৎসেনের জীবদ্দশায় তাদের প্রতিক্রিয়াশীল কর্ম্মপন্থা অধিক দূর অগ্রসর হ'তে পারে নি। সুনইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর দক্ষিণপন্থীদের প্ররোচনায় চিয়াংকাইসেক ১৯২৬-এর মার্চ মাসে ক্যাণ্টন শহরে কমিউনিস্টদের গ্রেফ্তার ক'রে গণশক্তির ঐক্যকে ভেঙে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রুশ মন্ত্রণাদায়ক বরোদিনের চেষ্টায় সে-যাত্রা "সম্মিলিত ফ্রণ্ট" রক্ষা পায়।

মাওৎসেতুঙ তখন কৃষক-আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। হুনান্, চাংসা, লিলিং, সিয়াংটান, লুংশান ও সিয়াংসিয়াঙ পরিভ্রমণ ক'রে মাওৎসেতুঙ কৃষক-আন্দোলন সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এই ভ্রমণের ফলে

তাঁর কর্ম্মপদ্ধতিতেই যে কৃষক-আন্দোলন সাফল্যযুক্ত হবে সে-সম্বন্ধে মাওৎসেতুঙ সুনিশ্চিত হ'লেন। তাই কৃষক-আন্দোলন সম্বন্ধে চেন-তু-সিউর কর্ম্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করে নতুন কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করবার জন্যে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট এক আবেদন করেন। অন্যদিকে ১৯২৭-এর বসন্তকালের প্রথম দিকে উহানে চীনের সমস্ত প্রদেশের কৃষক ও কৃষককর্ম্মীদের এক সভায় তিনি কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে জমি বণ্টনের প্রস্তাব করেন। এই সভায় ইয়র্ক ও ভোলেন নামে দুইজন রুশ কমিউনিস্ট উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে মাওৎসেতুঙ-এর প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং কুওচানটাঙ-এর পঞ্চম অধিবেশনে ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করবার সিদ্ধান্তও করা হয়। কিন্তু পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল।

কুঙচানটাঙ-এর পঞ্চম অধিবেশন হয় ১৯২৭-এর মে মাসে উহানে; পার্টির ভিতর তখন চেন-তু-সিউর প্রাধান্যই প্রবল। ইতিমধ্যে চিয়াংকাইসেকের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়ে; নানকিং ও সাংহাইতে চীনা বুর্জ্জোয়াদের প্রতিনিধি হ'য়ে চিয়াংকাইসেক কমিউনিস্টদের উপর নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করতে আরম্ভ করেছিলেন; কমিউনিস্ট দমনই তখন তাঁর লক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। এ ঘটনা সত্ত্বেও চেন-তু-সিউ উহানস্থিত কুয়োমিনটাঙ-এর লেজুড় হ'য়ে চলবার সঙ্কল্প করেন এবং মাওৎসেতুঙ ও তাঁর সহকর্ম্মীদের শত বাধা উপেক্ষা ক'রে তিনি কুঙচানটাঙকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী পেটী বুর্জোয়া নির্দ্দেশিত পথে চালিত করতে থাকেন। মাওৎসেতুঙ প্রভৃতির কৃষক ও ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধীয় মতবাদকে গ্রহণ করবার উপযুক্ত চিন্তাশক্তি চেন-তু-সিউর ছিল না; তাঁর কাছে এ-মতবাদ ছিল উপেক্ষণীয়। চীনের বিপ্লবান্দোলনে কৃষকদের স্থান কোথায়? এবং কি বিশিষ্ট অংশই বা কৃষকেরা সেই আন্দোলন গ্রহণ করবে?—এ সব সম্বন্ধে চেন-তু-সিউ ছিলেন সম্পূর্ণভাবে অন্ধ। তাঁর লক্ষ্য ছিল, যে-কোন ভাবে "সম্মিলিত ফ্রণ্ট"কে বাঁচিয়ে রাখা। কুঙচানটাঙ-এ তখন তাঁর অশেষ প্রভাব; পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিও তাঁর নির্দ্দেশে পরিচালিত। তাই পার্টির পঞ্চম অধিবেশনে মাওৎসেতুঙ-এর ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধীয় ও কৃষক-আন্দোলন ব্যাপকভাবে পরিচালনার

প্রস্তাব আদৌ আলোচিত হ'ল না। প্রকৃতপক্ষে উহানস্থিত কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ গ্রুপকে সন্তুষ্ট রেখে সম্মিলিত ফ্রণ্ট বাঁচিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে পার্টির এই পঞ্চম অধিবেশনে কৃষক-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিকে, এবং কৃষক ও জমিদারদের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। সম্মিলিত ফ্রণ্টকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে চেন-তু-সিউ'র এ-চেষ্টার অর্থ হচ্ছে চীনের বিপ্লবী শক্তিকে সঙ্কুচিত করা। চেন-তু-সিউর সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী পেটী বুর্জোয়া মনোবৃত্তির কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন করে কাজ করতে আরম্ভ ক'রেও যে কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন অস্তিত্ব রাখা প্রয়োজন সে-কথা চেন-তু-সিউ বুঝতে পারেন নি। এ-কথা তখন বুঝেছিল শুধু মাওৎসেতুঙ ও তাঁর সহকর্ম্মীরা। পার্টির পঞ্চম অধিবেশনে যখন কেন্দ্রীয় কমিটি মাওৎসেতুঙ-এর প্রস্তাব আলোচনার বিষয়বস্তু বলেই মনে করল না, তখন স্বাধীনভাবে মাওৎসেতুঙ ও তাঁর সহকর্ম্মীরা নিখিল-চীন কৃষক-সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন এবং মাওৎসেতুঙ তার প্রথম সভাপতি হন। কৃষক-সমিতির প্রতি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ হ'য়ে পড়া সত্ত্বেও হুপেই, কিয়াংসি, ফুকিয়েন এবং বিশেষ ক'রে হুনান প্রদেশে কৃষক-আন্দোলন বিপ্লবাত্মক রূপ ধারণ করে। কৃষক-আন্দোলনের এইরূপ অগ্রগতি দেখে কুয়োমিন্‌টাঙ-এর বুর্জোয়ারা দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন হ'তে আরম্ভ করে। কুয়োমিন্‌টাঙ-এর বুর্জোয়াদের মতিগতি দেখে কমিউনিস্ট নেতা চেন-তু-সিউ শঙ্কাকুল হ'য়ে পড়লেন। কাল বিলম্ব না করে তিনি মাওৎসেতুঙকে হুনান থেকে অন্যত্র চলে যাবার আদেশ দিলেন এবং তাঁর কার্য্যাবলীর নিন্দা ক'রে সম্মিলিত ফ্রণ্টকে দুর্ব্বল করবার জন্যে তাঁকে দায়ী করলেন।

ইতিমধ্যে চিয়াংকাইসেক ও তাঁর অনুচরেরা নানকিং, সাংহাই ও ক্যাণ্টনে কমিউনিস্ট নিপীড়নের আন্দোলন প্রবলভাবে আরম্ভ করে দিয়েছিল। ১৯২৭-এর ২১শে মে হুনানে "সুকোপিয়াং" বিদ্রোহ আরম্ভ হয়; শত শত শ্রমিক ও কৃষকের রক্তে হুনানের রাজপথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে। এর কিছুদিন পরে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে উহানে। উহান ছিল তখন কুয়োমিন্‌টাঙ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির

প্রধান কেন্দ্র এবং সেখানে কুয়োমিন্‌টাঙ-এর বামপন্থীদেরই ছিল প্রাধান্য। এই বামপন্থীদের নেতা এবং উহান-গভর্ণমেণ্টের সভাপতি ওয়াংচিংওয়াইকে কমিনটার্নের তদানীন্তন ভারতীয় ডেলিগেট মানবেন্দ্রনাথ রায় চাষীদের ভূমি-স্বত্ব সম্বন্ধে মস্কো থেকে আসা এক গোপনীয় তার বিনানুমতিতে দেখান। কমিনটার্ন বরোদিনের নিকট এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাঠান যাতে পার্টি জমিদারদের জমি বাজেয়াফ্‌ত করতে আরম্ভ করে দেয়। মানবেন্দ্রনাথ সেই সংবাদের একটা নকল সংগ্রহ ক'রে তৎক্ষণাৎ ওয়াংচিংওয়াইকে দেখিয়ে দেন। মানবেন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসঘাতকতায় চীনে সম্মিলিত ফ্রন্টের অবসান ঘটে, কুয়োমিন্‌টাঙ থেকে কমিউনিস্টরা বিতাড়িত হ'ল। ধীরে ধীরে চিয়াংকাইসেক চীনে সর্ব্বেসর্ব্বা হ'য়ে ওঠেন। কমিউনিস্টরা অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে সাংহাই ও রাশিয়ায় আশ্রয় নিতে থাকে। মাওৎসেতুঙ হুনানে গিয়ে কৃষক-আন্দোলন পরিচালনা করবার অনুমতি চেয়ে পাঠালেন; কিন্তু চেন-তু-সিউ তাঁকে সে-অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। কুঙচান্‌টাঙ-এর ভিতর এক অরাজকতার সৃষ্টি হয়; পার্টির অধিকাংশ সভ্যই চেন-তু-সিউর নেতৃত্ব ও তাঁর সুবিধাবাদী কর্ম্মপদ্ধতির বিরোধিতা করতে আরম্ভ করল।

এইভাবে চীনে দ্বিতীয় বিপ্লবের অবসান ঘটে এবং নানকিং ডিক্টেটরশিপের প্রতিষ্ঠা হয়। নানকিং-এ প্রতিক্রিয়াপন্থী বুর্জোয়াদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই চীনে তৃতীয় বিপ্লবের বীজ রোপিত হ'ল।

কিন্তু ১৯২৭ সালে কুঙচানটাঙ-এর এই পরাজয়, সম্মিলিত ফ্রন্টের ভাঙন ও নানকিং ডিক্টেটরশিপের জয়ের জন্য দায়ী কে বা কাহারা? মাওৎসেতুঙ-এর কথায়, এর জন্যে প্রথমত দায়ী পার্টির তদানীন্তন নেতা চেন-তু-সিউ। শ্রমিক এবং সশস্ত্র কৃষকদের বিপ্লবী মনোভাব দেখে চেন-তু-সিউ সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, আশু বিপ্লবের আশঙ্কায় তাঁর চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হয়েছিল। এই সময় তিনি পার্টির একরকম ডিক্টেটর ছিলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা না ক'রে মস্কো থেকে আসা কমিন্‌টার্নের আদেশ কোন সভ্যকে না দেখিয়ে তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী চলছিলেন। চেন-তু-সিউর দোদুল্যমান সুবিধাবাদী

কর্ম্মপন্থা ও তাঁর নেতৃত্ব পার্টিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছিল। চেন-তু-সিউর যে-কোন ভাবে কুয়োমিন্টাঙ-এর সঙ্গে মানিয়ে চলার স্পৃহাই পার্টির পরাজয়ের আসল কারণ। চেন-তু-সিউর পর বরোদিনকে দায়ী করা চলে। ১৯২৬-এ বরোদিন কৃষকদের ভিতর জমি বণ্টন সমর্থন করেছিলেন; কিন্তু ১৯২৭-এ কোন কারণ না দেখিয়ে জমি বণ্টনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে থাকেন। বরোদিন চেন-তু-সিউর চেয়েও দক্ষিণপন্থী ছিলেন। বুর্জোয়াদের মনস্তুষ্টির জন্যে তিনি সব কিছুই করতে স্বীকৃত ছিলেন, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত শ্রমিকদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেবার আদেশও তিনি দিয়েছিলেন। কমিনটার্নের ভারতীয় ডেলিগেট মানবেন্দ্রনাথও পার্টির এই পরাজয়ের জন্যে কম দায়ী নন। তিনি কাজের চেয়ে বেশী কথা ব'লে হৈ চৈ করতেন; কোন কর্ম্মপদ্ধতি দেবার ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তি তাঁর ছিল না, এবং শেষ পর্য্যন্ত মস্কোর টেলিগ্রাম বিনানুমতিতে দেখিয়ে "সম্মিলিত ফ্রণ্ট"কে তিনিই ভাঙ্গেন।

মাওৎসেতুঙ-এর মতে: "বস্তুতপক্ষে রায় মূর্খের মত এবং চেন অজ্ঞাতসারে বিশ্বাসঘাতকের মত কাজ করেছিলেন, আর বরোদিন মস্ত বড় ভুল করেছিলেন।"

চীনে সোভিয়েট আন্দোলন

১৯২৭-এ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পরাজয়ের ভিতর দিয়ে সম্মিলিত ফ্রণ্টের ভাঙ্গনের মধ্য দিয়েই সোভিয়েট চীনের অভ্যুত্থান। চীনের দ্বিতীয় বিপ্লবের ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে চীনের তৃতীয় বিপ্লবের, চীনের রক্ত-বিপ্লবের আবির্ভাব প্রাচ্যের উপনিবেশসমূহের জাতীয় জীবনে নব প্রেরণার সঞ্চার করল। বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্র ও দেশীয় বুর্জোয়াদের শত অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করেও যে উপনিবেশে কমিউনিস্টরা তাদের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ চীনের এক অংশে সোভিয়েট স্থাপন ও চীনের লালফৌজের প্রতিষ্ঠা।

উহানে মানবেন্দ্রনাথের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে সম্মিলিত ফ্রণ্টের ভাঙ্গনে বুর্জোয়াদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হল। সেই প্রশস্ত পথ

কণ্টকমুক্ত করবার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়াদের নব প্রতিনিধি চিয়াংকাইসেক তাঁর কমিউনিস্ট পীড়নের আন্দোলন তীব্রতর ক'রে তোলেন। কমিউনিস্ট-দমনের বীভৎস রূপ দেখে কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর বামপন্থীদের ভিতর এক সম্প্রদায় টি-সি-উ, মাদাম সুনইয়াৎসেন প্রভৃতি চীন ত্যাগ ক'রে মস্কোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন; আর এক সম্প্রদায় ওয়াংচিংওয়াই প্রভৃতি চিয়াংকাইসেকের দমননীতির দর্শকরূপে চীনে অবস্থান করতে থাকেন। কমিউনিস্টদের তখন সাধনা হয়েছিল চিয়াংকাইসেকের দমননীতিকে ব্যর্থ ক'রে চীনে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা করা। চীনের পরবর্ত্তী ইতিহাস চিয়াংকাইসেকের দমননীতির ব্যর্থতার ও কমিউনিস্টদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার সার্থকতার সাক্ষ্য দেয়।

কমিউনিস্টদের কর্ত্তব্য সর্ব্বদা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার। চিরদিন লক্ষ্য অবিচলিত রেখে স্থানকাল অনুসারে কর্ম্মপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত ক'রতে কমিউনিস্টরা দ্বিধা করে না। উহানের অঘটনে প্রমাণিত হ'লো যে পার্টির কর্ম্মপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করা একান্ত প্রয়োজন। কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর সঙ্গে সহযোগিতার আশা ত্যাগ করা ছাড়া কমিউনিস্টদের গত্যন্তর ছিল না। কারণ চিয়াংকাইসেকের অধিনায়কত্বে কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ তখন সুনইয়াৎসেনের আদর্শ ও তাঁর সান-মিন-নীতির তিন প্রস্তাবকে পীতসাগরে বিসর্জ্জন দিয়েছিল; বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্র আর তার চীনা অনুচরদের স্বার্থ সংরক্ষণ করাই ছিল তখন কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর প্রধান কাজ। ১৯২৭-এর ৭ই আগস্ট কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সে-অধিবেশনের প্রধান কীর্ত্তি চেন-তু-সিউকে পার্টির সেক্রেটারীর পদ থেকে অপসারণ ও মাওৎসেতুঙ-এর কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ। কুয়োমিন্‌টাঙ্‌ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ বিচ্ছেদ, কৃষক ও শ্রমিকদের বিপ্লবী বাহিনী গঠন; ভূমিস্বত্বাধিকারীদের সম্পত্তি অধিকার; হুনান প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টির আধিপত্য স্থাপন এবং সোভিয়েটের সংগঠন—এই পাঁচটি প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করাই মাওৎসেতুঙ-এর কর্ম্মপদ্ধতির মূল কথা। তাঁর পঞ্চম প্রস্তাব—সোভিয়েটের সংগঠন কমিনটার্ন সে-সময় অনুমোদন করে নাই; তাই কমিউনিস্টরা এ-প্রস্তাবকে স্লোগান হিসাবে ব্যবহারে বিরত থাকে।

হুনান প্রদেশকে ভিত্তি করে মাওৎসেতুঙ ও তাঁর সহকর্ম্মীরা কাজ আরম্ভ করেন। ১৮২৭-এর সেপ্টেম্বরে হুনানের কৃষকসমিতিগুলির তত্ত্বাবধানে এক ব্যাপক বিপ্লবান্দোলনের সৃষ্টি, হ্যানিয়াঙ খনির শ্রমিক, হুনানের কৃষক-সম্প্রদায় এবং কুয়োমিন্টাঙ্-এর বিদ্রোহী সৈনিকদের নিয়ে কৃষক-শ্রমিকদের বিপ্লবী বাহিনীর প্রথম ইউনিটের সংগঠন এবং ক্রমান্বয়ে আরো কয়েকটি ইউনিটের গঠন মাওৎসেতুঙ ও তাঁর সহকর্ম্মীদের কর্ম্মপ্রচেষ্টারই ফল। কিন্তু এ কর্ম্ম-ধারা এবং বিশেষ করে বিপ্লবী বাহিনী গঠন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মনঃপূত হল না। কেন্দ্রীয় কমিটির ভিতর তখনো দোদুল্যমান ভাবধারার প্রাধান্য বিদ্যমান। যদিও কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ অধিবেশনে (১৯২৭ আগস্ট) মাওৎ-সেতুঙ-এর কর্ম্মপদ্ধতিই গৃহীত হয়েছিল, তবু বাস্তব ক্ষেত্রে সে-কর্ম্মপদ্ধতির যথাযথ পরিণতি দেখে কেন্দ্রীয় কমিটি শঙ্কাকুল হয়ে উঠেছিল। অনেক ক্ষেত্রে মাওৎ-সেতুঙ-এর কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিরোধিতা করতেও কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বিধা করে নি। কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন ব্যতিরেকেই মাওসেতুঙ-এর চেষ্টায় "রবিশস্যের জন্য বিদ্রোহ" হুনানে এক অভূতপূর্ব্ব আন্দোলনের সৃষ্টি করল। কৃষক-শ্রমিকদের বিপ্লবী বাহিনীর দ্রুত প্রসার এবং তার বিপ্লব-প্রচেষ্টার সঙ্গে সমান তালে চলবার সামর্থ্য কেন্দ্রীয় কমিটির ছিল না। কেন্দ্রীয় কমিটির ধারণা ছিল যে, কৃষক-শ্রমিকদের বিপ্লবী বাহিনীর আশু পতন অবশ্যম্ভাবী এবং সে-ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে হুনান প্রদেশের বিপ্লবান্দোলনের সমস্ত দায়িত্ব মাওৎসেতুঙ-এর স্কন্ধে চাপানো হয় এবং তাঁকে পার্টির পলিটব্যুরো থেকে অপসারিত করা হয়। হুনানের প্রাদেশিক কমিটি পর্য্যন্ত তখন মাওৎসেতুঙ-এর বিপক্ষে ছিল। বাহিরে চিয়াংকাইসেকের নিষ্ঠুর উৎপীড়ন, ভিতরে পার্টির উর্দ্ধতন কমিটির বিরোধিতা মাওৎসেতুঙ ও তাঁর সহকর্ম্মীদের তাঁদের কর্ম্মপন্থা থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তাঁদের কর্ম্মপদ্ধতি যে নির্ভুল ও মার্ক্স্‌বিজ্ঞান-সম্মত সে-সম্বন্ধে তাঁদের ভিতর কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাই চিঙকানশানে কৃষক ও শ্রমিকদের সমস্ত বিপ্লবী বাহিনীকে একত্রিত ক'রে তাঁরা বিপ্লবান্দোলন সুতীব্র ক'রে তুলতে থাকেন। সেদিন যদি মাওৎসেতুঙ ও তাঁর সহকর্ম্মীরা পার্টির

কেন্দ্রীয় কমিটির মত ও পথ স্বীকার ক'রে তাঁদের আন্দোলন বন্ধ করে দিতেন, তবে চীনে কমিউনিজ্‌মের ইতিহাস আজ তমসাবৃত থাকত। সে-সময়ে পার্টির একটি গ্রুপ কেন্দ্রীয় কমিটির মত সমর্থন ক'রে দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে পড়েছিল—এই গ্রুপটি মাওৎসেতুঙ-এর নীতি অতিমাত্রায় দুঃসাহসিক মনে করত; অন্যদিকে আর একটি গ্রুপ বামদিকে ঝুঁকে পড়েছিল—তাদের নীতি ছিল বাড়ীঘর জ্বালিয়ে জমিদারদের ধ্বংস সাধন করে দেশব্যাপী এক অদ্ভুত সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি করা। বিপ্লবান্দোলনকে এই দুই দিক থেকে বিকৃত করবার ঝোঁক মাওৎসেতুঙকে সামলাতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনটি ফ্রন্টে মাওৎসেতুঙ ও তাঁর সহকর্ম্মীদের যুঝতে হচ্ছিল—চিয়াংকাইসেকের সৈন্যদের সঙ্গে, আর পার্টির অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের সঙ্গে।

চিঙকানশানে কৃষক-শ্রমিকদের বিপ্লবী বাহিনীর ঘাঁটি ক'রে মাওৎসেতুঙ ও তাঁর সহকর্ম্মীরা চীনে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠার কার্য্যে ব্রতী হলেন। ১৯২৭-এ হুনানের এক প্রান্তে চা'লিনে চীনের প্রথম সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়েছিল; গণতান্ত্রিক প্রোগ্রাম নিয়ে এর কার্য্যারম্ভ। এ-গবর্ণমেণ্টের সভাপতি ছিলেন তুউংসুঙশিঙ। ১৯২৮-এর মে মাসে চু'তে তাঁর সহকর্ম্মীদের নিয়ে চিঙকানশানে এসে মাওৎসেতুঙ-এর সঙ্গে যোগদান করেন। ১৯২৭-এর আগস্টের "নানচাঙ-বিদ্রোহে" (Nanchang Uprising) চু'তের খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। মাওৎসেতুঙ ও চু'তে আলাপ আলোচনা করে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতির এক পরিকল্পনা করেন। সে-পরিকল্পনার মূল কথা হচ্ছে হুনান—কিয়াংশি-কোয়াঙচুঙ প্রদেশের সীমান্তস্থিত শহরগুলিতে সোভিয়েট স্থাপন করে সেখানে কমিউনিস্টদের শক্তিকে সুসংবদ্ধ করা এবং ধীরে ধীরে অন্য শহরগুলিতে কমিউনিজ্‌মের প্রভাব বিস্তার করে সোভিয়েট স্থাপন করা। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও বাধা এল কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে। সোভিয়েট আন্দোলনের প্রারম্ভে কেন্দ্রীয় কমিটি যেরূপে বাধা দিয়েছিল, এ-ক্ষেত্রে বাধা এল তার বিপরীত রূপে। কেন্দ্রীয় কমিটি সোভিয়েট আন্দোলনের দ্রুত প্রসারের জন্যে চাপ দিল। একদিকে কেন্দ্রীয় কমিটির সোভিয়েট আন্দোলনের দ্রুত প্রসারের নীতি, অন্যদিকে বিপ্লবী

বাহিনীর ভিতর দু'টি বিপরীত ঝোঁকের সম্মুখীন হ'তে হ'ল মাওৎসেতুঙ ও চু'তে-কে। বিপ্লবী বাহিনীর একদল কালবিলম্ব না ক'রে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা-কল্পে চাংশা অভিমুখে অগ্রসর হবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল; আর একদল আদৌ অগ্রসর হ'তে স্বীকৃত ছিল না; যেখানে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠিত সেখানে তারা ফিরে আসবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। কিন্তু মাওৎসেতুঙ ও চু'তের কর্ম্মপন্থা ছিল কৃষকদের ভিতর জমি বণ্টন ক'রে বিজিত শহরগুলিতে সোভিয়েট স্থাপন এবং জনগণকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ক'রে ধীরে ধীরে অন্যান্য শহরগুলিতে সোভিয়েট আন্দোলনের প্রসার বিস্তৃত করা। ১৯২৮-এর শরৎকালে চিঙকানশানে উত্তর সীমান্তের সোভিয়েট শহরগুলির প্রতিনিধিদের এক সভায় মাওৎসেতুঙ ও চু'তের কর্ম্মপন্থা গৃহীত হ'লো। কেন্দ্রীয় কমিটি তখনো এ-কর্ম্মপন্থা অনুমোদন করে নাই। চীনের এই অবস্থায় মস্কোতে কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত কর্ম্মপদ্ধতি চীনে এসে পৌছলো; মাওৎসেতুঙ ও চু'তে সে-কর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে একমত হলেন। ফলে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সোভিয়েট আন্দোলনের পরিচালকদের বিরোধের অবসান ঘটে।

ইতিমধ্যে কৃষক-শ্রমিকদের বিপ্লবী বাহিনীর কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফলে লুপেহ্‌, কিয়াংশি সীমান্ত ও কিয়ানে সোভিয়েট আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করেছিল। কিয়ান সোভিয়েট চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান ঘাঁটি হ'য়ে দাঁড়ায়। সোভিয়েট আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে লালফৌজের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি ও তার সংগঠনপ্রণালী নির্দ্ধারণের জন্য ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে ফুকিয়েন প্রদেশে পার্টির এক কনফারেন্স হয়; সেখানে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে ট্রট্‌স্কী-পন্থীদের প্রভাব বিস্তার পরিকল্পনা এবং লালফৌজের ধ্বংসসাধনে তাদের প্রচেষ্টা প্রকাশ হ'য়ে পড়লো। সুতরাং ট্রট্‌স্কীপন্থীদের পার্টি থেকে বিতাড়িত করা হয়। একদিকে ট্রট্‌স্কীপন্থীদের পার্টি থেকে বিতাড়ন, অন্যদিকে লালফৌজের সংস্কার ও পুনর্গঠন—ফুকিয়েন কনফারেন্সের এই সিদ্ধান্ত পার্টিকে শক্তিশালী ক'রে তুলেছিল। ফলে অল্পকালের ভিতরেই সমগ্র দক্ষিণ কিয়াংশি প্রদেশে লালফৌজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ১৯৩০-এর ৭ই ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ

কিয়াংশিতে স্থানীয় পার্টির এক বিশেষ অধিবেশনে সোভিয়েটের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনার পর কিয়াংশিতে প্রাদেশিক সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়।

সোভিয়েট আন্দোলনের প্রসারের ফলে যখন চীনের এক-চতুর্থাংশে সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করতে কমিউনিস্টরা সক্ষম হল, তখন তারা সেভিয়েটের প্রথম কংগ্রেস আহ্বান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তৎ-কালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সোভিয়েট-কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়া সহজসাধ্য ছিল না। তাই ১৯৩০-এর ৩০শে মে কমিউনিস্ট পার্টি সাংহাইতে সোভিয়েট-সমূহের প্রতিনিধিদের প্রথম প্রাথমিক কনফারেন্স আহ্বান করে। সোভিয়েট প্রতিনিধিরা সংগোপনে চিয়াংকাইসেকের দমননীতির বেড়াজাল ডিঙিয়ে সুদূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র ও অত্যাচার-উৎপীড়নের লীলাভূমি সাং-হাইতে এসে উপস্থিত হলেন। কনফারেন্সে প্রথম কংগ্রেসের কর্ম্মধারার এক খসড়া প্রস্তুত করা হয় এবং স্থির হয় যে ঐ বৎসরই ১১ই ডিসেম্বর কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে হ'বে। কংগ্রেসের জন্যে নিজ নিজ সোভিয়েটকে তৈরী করবার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিরা নিজ নিজ সোভিয়েটে ফিরে আসেন।

কংগ্রেসকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে সাংহাইতে একটা কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিও গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই কমিটির কাজ বেশি অগ্রসর হতে পারে নি, কারণ ডিসেম্বরের পূর্ব্বেই চিয়াংকাইসেক বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সোভিয়েট চীনের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়ের সূচনা করেন। সোভিয়েট চীনের ধ্বংস সাধন চিয়াংকাইসেকের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। কমিউনিস্টরা লাল ফৌজের সাহায্যে চিয়াংকাইসেকের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে আরম্ভ করে। সুতরাং এই সংগ্রামের জন্যে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের তারিখ ১৯৩১-এর ৩০শে মে পর্য্যন্ত পিছিয়ে দিতে কমিউনিস্টরা বাধ্য হয়েছিল।

সোভিয়েট চীনের বিরুদ্ধে দেশীয় বুর্জ্জোয়াদের ও বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্রের সংগ্রাম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রুশ বিপ্লবের পরবর্ত্তী ইতিহাস। রুশ

বিপ্লব যখন জয়যুক্ত হল এবং রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রীদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হল, তখন ধনিকপ্রভুদের স্বার্থ রক্ষার্থে ইংরাজ, ফরাসী, ও মার্কিন সৈন্য রুশদের আক্রমণ করে; সে-আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার ধ্বংস সাধন। চীনেও যখন এক-চতুর্থাংশে সাম্যবাদীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল, তখন সোভিয়েট চীনের উচ্ছেদকল্পে দেশীয় বুর্জোয়ারা বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্রের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করে, তাদেরই সহায়তায় সাম্যবাদী চীনকে আক্রমণ করে। চীনে সোভিয়েটের প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য সংক্রামক বীজের ন্যায় প্রাচ্যের উপনিবেশসমূহে ছড়িয়ে পড়বে, এ-আশঙ্কায় সাম্রাজ্যবাদীরা শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু রাশিয়ার লালফৌজ সোভিয়েট রাশিয়াকে রক্ষা করেছিল, চীনের লালফৌজের দৃঢ়তাও শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রামে জয়ী হয়েছিল।

চিয়াংকাইসেকের আক্রমণের জন্যে কংগ্রেসের অধিবেশনের তারিখ আরো পিছিয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু সাংহাইস্থিত কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির কাজ দ্রুত গতিতেই চল্‌ছিল। ১৯৩১-এর জানুয়ারীতে বৃটিশ পুলিস কর্তৃপক্ষ সাংহাইতে এই কমিটির চব্বিশ জন সভ্যকে হঠাৎ গ্রেফ্‌তার ক'রে চিয়াংকাইসেকের হস্তে সমর্পণ করে। চব্বিশ জন কমিউনিস্টকে হাতে পেয়ে চিয়াংকাইসেক উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন; প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার এমন অপূর্ব্ব সুযোগ চিয়াংকাইসেকের জীবনে আর আসেনি। প্রথমে চিয়াংকাইসেক চেষ্টা করলেন এই চব্বিশ জনকে নানা প্রলোভনে ভুলাতে যাতে তারা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে কুয়োমিন্‌টাঙে এসে যোগদান করে। কিন্তু সে-পথে যখন কোন সুফল হ'ল না, তখন আরম্ভ হ'ল সেই চিরাচরিত প্রথায় অত্যাচার, উৎপীড়ন। অত্যাচার-উৎপীড়নেও যখন ঐ চব্বিশ জন কমিউনিস্টকে টলানো গেল না, তখন ফেব্রুয়ারীর এক গভীর রাত্রে তাদের কারাকক্ষ থেকে বের করে সমাধি-প্রাঙ্গনে এনে দাঁড় করান হ'ল। তারপর তাদের উপর আদেশ হয় নিজেদের সমাধি রচনা করবার। এ-আদেশে কমিউনিস্টরা অটল থাকে; "ইণ্টারন্যাশনাল" গাইতে গাইতে তারা রচনা করলো নিজেদের সমাধি। প্রথমে পাঁচ জনকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হ'ল; তাদের যন্ত্রণার অস্ফুট ধ্বনি মিলিয়ে গেল আর বাকী

উনিশ জনের ইণ্টারন্যাশনাল সুরলহরীর ভিতর। কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর যে-সকল সৈন্যদের উপর এই নিষ্ঠুর কাজের ভার পড়েছিল তারা এই করুণ দৃশ্য আর সহ্য করতে পারল না; তাই আর বাকী উনিশ জনকে তারা গুলি ক'রে মেরে ফেলল।

এই চব্বিশ জন কমিউনিস্টদের তপ্ত শোণিতে চীনে রক্তপতাকা আরো রক্তিম হ'য়ে ওঠে। সমস্ত ফ্রণ্টেই কুয়োমিন্‌টাঙ-এর সৈন্যদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে লালফৌজ ঘোষণা করল যে, সুইকিন শহরে এ-বৎসরের (১৯৩১) ভিতরেই কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। সুইকিন থেকে দশ লি (তিন লি'তে এক মাইল) উত্তরে ইয়েপিঙ গ্রামে কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। চিয়াংকাইসেক যাতে বোমাবর্ষণ ক'রে কংগ্রেসের অধিবেশন ভেঙ্গে না দিতে পারেন সে-জন্যে ইয়েপিঙ-এ কংগ্রেসের স্থান লালফৌজের নেতারা সরিয়ে এনেছিলেন। কারণ সুইকিনে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে সে-সংবাদ চিয়াংকাইসেকের অনুচরেরা জেনেছিল। কংগ্রেসের দিন ধার্য্য হয় এক ঐতিহাসিক দিনকে স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্যে। সে-দিন হ'ল ৭ই নভেম্বর। রুশ বিপ্লবের পর থেকে ৭ই নভেম্বর বিশ্বের সর্ব্বহারাদের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে।

৫ই ও ৬ই নভেম্বরের ভিতর চীনের সমস্ত প্রদেশ, সোভিয়েট চীনের সমস্ত শহর, এমন কি জাপ-অধিকৃত ফরমোসা ও কোরিয়া থেকেও প্রতিনিধি এসে ইয়েপিঙ-এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা করে। আবালবৃদ্ধবনিতা, অধ্যাপক, শিল্পী, অভিনেতা, সাংবাদিক, শ্রমিক, কৃষক—সবার অপূর্ব্ব সমাবেশে ইয়েপিঙ-এ এক নবজীবনের সূচনা হয়। সর্ব্বসমেত প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি সে-অধিবেশনে যোগদান করেছিল; তাদের ভিতর ছিল পনেরো বৎসরের এক কিশোর, আর ষাট বৎসরের এক বৃদ্ধা।

৭ই নভেম্বর লালফৌজের যুদ্ধের গান গাইবার পর লালফৌজের রাজনীতি-বিভাগের প্রধান কর্ম্মসচিব ওয়াং-কাই-সিয়াং কংগ্রেসের উদ্বোধন-কার্য্য সমাপ্ত করেন। পরে সেনানায়ক চু'তে লালফৌজের পক্ষ থেকে সকলকে অভিনন্দন

জ্ঞাপন করলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী মাওৎসেতুঙ যথারীতি কংগ্রেসের কার্য্য আরম্ভ করেন।

৭ই থেকে ২৩শে নভেম্বর পর্য্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশন চলেছিল। কংগ্রেসে প্রধানত সোভিয়েটের শাসনতন্ত্র ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি রচিত হয়।

২৩শে নভেম্বর মধ্য রাত্রিতে "ইণ্টারন্যাশনাল" গাইবার পর "সোভিয়েট চীনকে অস্ত্র দিয়ে রক্ষা করো" এই স্লোগানের ভিতর কংগ্রেসের কার্য্য শেষ হয়।

এমনি ভাবে চীনের এক-চতুর্থাংশে সোভিয়েট রিপাব্লিকের প্রতিষ্ঠা হ'ল।

চিয়াংকাইসেক ও লালফৌজ

রুশ-বিপ্লবের পর বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্র, জারের অনুচরবৃন্দ এবং রাশিয়ান বুর্জোয়াদের আক্রমণ থেকে সোভিয়েট রাশিয়াকে রক্ষা করেছিল রাশিয়ার লালফৌজ। ইতিহাসের এই স্মরণীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চীনে; বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্র আর তার চীনা অনুচর এবং চিয়াংকাইসেকের আক্রমণ থেকে সোভিয়েট-চীনকে রক্ষা করল চীনের লালফৌজ। ১৯৩০-এ কিয়াংসিতে সোভিয়েটের শক্তি এবং চীনের অনেকাংশে সোভিয়েট আন্দোলনের অগ্রগতি চিয়াংকাইসেক ও তাঁর সমর্থক দেশীয় বুর্জোয়াদের চিন্তিত করে তোলে। চিয়াংকাইসেক দেখলেন যে, সাম্যবাদী চীনকে ধ্বংস করতে হ'লে প্রথম থেকেই আঘাত করা প্রয়োজন। এবং সে-উদ্দেশ্যে সোভিয়েট চীন ও তার রক্ষক চীনের লালফৌজের বিরুদ্ধে তিনি সশস্ত্র অভিযানের পরিকল্পনা করলেন। এ রকম পাঁচটি অভিযান পরিচালনা করে পরিশেষে তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সাম্যবাদী চীনকে জয় করা শেষ পর্য্যন্ত সম্ভব হয়নি।

চিয়াংকাইসেকের প্রথম অভিযানের আরম্ভ ১৯৩০-এর শেষের দিকে। লু-তি-পিঙ-এর পরিচালনায় কুয়োমিন্টাঙ্-এর এক লক্ষ সেনানী পাঁচ দিক থেকে চীনের সোভিয়েট চিহ্নিত দেশগুলিকে আক্রমণ করে। এ আক্রমণের প্রতি-

রোধ কল্পে লালফৌজ চল্লিশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। সৈন্যসংখ্যা ছাড়া লালফৌজের প্রধান অস্ত্র ছিল সোভিয়েটের রক্ষাকল্পে তাদের সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও গেরিলা-রণকৌশল ; ১৯৩১-এর জানুয়ারীর মধ্যেই কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর বাহিনী পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। এ-ঘটনার চার মাস পরে ১৯৩২-এর মে মাসে আরম্ভ হল কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর দ্বিতীয় অভিযান। কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-সেনানায়ক হোইঙ-চিঙ দু'লক্ষের অধিক সেনানী নিয়ে সাত দিক থেকে সোভিয়েট চীনকে আক্রমণ করে। লালফৌজের অবস্থা তখন সঙ্কটাপন্ন। আধুনিক রণ-সম্ভার ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-বাহিনীর বিরুদ্ধে অপ্রচুর রণসম্ভার ও অল্পসংখ্যক অস্ত্র নিয়ে সংগ্রাম করা লালফৌজের পক্ষে এক দুরূহ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও সুদৃঢ় সঙ্কল্প, আদর্শকে জয়যুক্ত করবার দৃঢ়তা এবং গেরিলা-রণকৌশল লালফৌজকে সংগ্রামে জয়ী করল। এ-সংগ্রাম চলেছিল দু'মাস।

লালফৌজের নিকট দু'বার পরাজিত হয়ে চিয়াংকাইসেক স্বয়ং তৃতীয় অভিযান পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয় অভিযান শেষ হবার এক মাস পরেই, ১৯৩১-এর জুলাইতে তিন লক্ষ সেনানী নিয়ে তিনি "চীনের লালদস্যু"-দের (কমিউনিস্টদের চিয়াংকাইসেক লালদস্যু আখ্যা দিয়েছিলেন) ধ্বংসসাধন-কল্পে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর সাহায্যার্থে কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর প্রসিদ্ধ সেনানায়ক চেন্‌মিঙসু, হোইঙ-চিঙ ও চু-সাও-লিয়াঙ সর্ব্বদাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিল। দৈনিক ৮০ লি (তিন লি'তে এক মাইল) ক'রে অগ্রসর হয়ে চিয়াং-কাইসেকের বাহিনী চতুর্দ্দিক থেকে সোভিয়েট-চিহ্নিত দেশগুলিকে আক্রমণ করে। লালফৌজ তাদের দৃঢ় সঙ্কল্প ও গেরিলা-রণনীতি থেকে বিচ্যুত না হয়ে মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্যের সাহায্যে চিয়াংকাইসেকের তিন লক্ষ সৈন্যকে হটিয়ে দিল। অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত চিয়াংকাইসেক সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। পরে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তিনি নানকিং শহরে প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য হলেন।

এই সময় চীনে দুটি বিপরীত ঘটনা ঘটে—সোভিয়েট কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আর জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রসার। ১৯৩১-এর ৭ই নভেম্বর

সোভিয়েট কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় এবং চীনের একাংশে সোভিয়েট শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩১-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর মাঞ্চুরিয়াতে আরম্ভ হয় জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রসার। চিয়াংকাইসেকের তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল সাম্যবাদী চীনের ধ্বংস সাধন। তাই জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রকে মাঞ্চুরিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ দিয়ে তিনি তাঁর সমগ্র শক্তি নিযুক্ত করেছিলেন সোভিয়েট চীনের বিরুদ্ধে।

চীনের সোভিয়েট কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের ফলে চীনে কেন্দ্রীয় সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয়; মাওৎসেতুঙ তার সভাপতি হন, আর লালফৌজের সমস্ত ভার অর্পিত হল চু'তের উপর।

১৯৩২-এর প্রারম্ভে চীনে কমিউনিজ্‌মের বিনাশকল্পে চিয়াংকাইসেক জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের সঙ্গে কতকগুলি গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। চীনে কমিউনিজ্‌মের ধ্বংসসাধনার্থে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যের বিনিময়ে মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনে জাপানী সাম্রাজ্য বিস্তারের অবাধ সুবিধা দানই এই চুক্তিগুলির মূল কথা। দেশের এই অবস্থায় চীনা সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ও লালফৌজের সম্মুখে ছিল দু'টি সমস্যা—জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের খপ্পর থেকে চীনকে রক্ষা করা, আর চিয়াংকাইসেকের আক্রমণ থেকে সোভিয়েট চীনকে বাঁচানো। কমিউনিস্টরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই দুটি সমস্যার সমাধানে ব্রতী হল। প্রথমত চীনা সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সমগ্র চীনের জনসাধারণের ভিতর চিয়াংকাইসেক ও কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে ইস্তেহার বিতরণ করলেন এবং চীনকে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের খপ্পর থেকে রক্ষা করবার জন্যে মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনে জাপানের অগ্রগতি সশস্ত্র প্রতিরোধ করতে জনসাধারণের নিকট আবেদন জানালেন। এ ছাড়া লালফৌজ কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর সৈন্যদের নিকটও এক আবেদন পাঠাল। সে-আবেদনের মূল কথা ছিল সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন করে জাপানের আক্রমণের প্রতিরোধ। সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনে লালফৌজ তিনটি দাবী করেছিল—(১) সোভিয়েট চীনের বিরুদ্ধে কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর সশস্ত্র অভিযানের বিরতি, (২) চীনের সমস্ত জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের

প্রতিষ্ঠা; (৩) জাপানের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশের অধিকার। এই আবেদন কুয়োমিন্টাঙ্-এর সৈন্যদের ভিতর এক আলোড়নের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্রের অর্থে পুষ্ট চিয়াংকাইসেক অচলঅটল; তিনি আদেশ দিলেন যে, সোভিয়েট চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিবর্ত্তে জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা যে বলবে তার শাস্তি হবে প্রাণদণ্ড।

দ্বিতীয়ত চিয়াংকাইসেকের তিনটি অভিযানকে ব্যর্থ করে দিয়ে লালফৌজ প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছিল। তারা বুঝেছিল যে, প্রতি-আক্রমণ করে কুয়োমিন্টাঙ্-বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলাই উত্তম পন্থা। সুতরাং চিয়াং-কাইসেককে কোন সুবিধা না দিয়ে কুয়োমিন্টাঙ্-এর পরিচালিত দেশগুলির দিকে তারা সশস্ত্র অভিযান আরম্ভ করল। ফলে ১৯৩২-এ সোভিয়েট চীনকে আক্রমণ করা চিয়াংকাইসেকের পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় নি; লালফৌজের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সমস্ত বৎসরই চিয়াংকাইসেককে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

চিয়াংকাইসেকের চতুর্থ অভিযানের আরম্ভ ১৯৩৩-এর এপ্রিলে। এ-অভিযান বিশেষ করে হুপেই ও কিয়াংসি প্রদেশকে ঘিরেই পরিচালিত হয়েছিল এবং অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত চলেছিল। বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্রের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে চিয়াংকাইসেক এ-অভিযানে চেনচেঙ-এর নেতৃত্বে আড়াই লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন। হুপেইতে প্রথমত লালফৌজ সাময়িক ভাবে হটে যায়। লালফৌজের চতুর্থ ইউনিট চীনের সুদূর পশ্চিম সীমান্তে শেচুয়ান প্রদেশে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। শেচুয়ানে এসে লালফৌজ এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করে—শ্রমিক ও কৃষকদের কমিউনিজ্‌মের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে তারা শেচুয়ানে সোভিয়েট শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করল। শেচুয়ানে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠায় বৃটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্র শঙ্কিত হয়ে ওঠে; চীনে তদানীন্তন বৃটিশ প্রতিনিধি স্বয়ং শেচুয়ানে গিয়ে কুয়োমিন্টাঙ্-সেনানায়ক লিউসিয়াঙকে সোভিয়েটের উচ্ছেদ-কল্পে প্ররোচিত করেন। সে-কার্য্য সম্পাদনের জন্যে কুড়ি মিলিয়ন পাউণ্ড লিউসিয়াঙকে ধার দেওয়া হল এবং তিব্বত থেকে বৃটিশ বাহিনী শেচুয়ানে এসে লিউসিয়াঙকে শক্তিশালী করে তুলল; কিন্তু লালফৌজকে পর্য্যুদস্ত

করা সম্ভব হল না। অন্যদিকে কিয়াংসি প্রদেশে লালফৌজ কুয়োমিন্টাঙ্-এর বাহিনীকে এমন ভাবে পরাজিত করল যে চিয়াকাইসেক মনঃকষ্টে চেনচেঙকে লিখলেন—লালফৌজের নিকট এ-পরাজয় তাঁর জীবনে চরম অপমান এবং চেনচেঙ যেন অবিলম্বে লালফৌজের বিরুদ্ধে আক্রমণ সুতীব্র করে তোলে। চেনচেঙ এর উত্তরে লিখলেন—"লালফৌজের ধ্বংস সাধন একদিনের কাজ নয়, এ সমস্ত জীবনের কাজ।"

পরাজয়ের গ্লানির মধ্যে চিয়াংকাইসেকের চতুর্থ অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটল। লালফৌজের নিকট কুয়োমিন্টাঙ্-এর চতুর্থ অভিযানের পরাজয় চীনের শাসক ও শোষক সম্প্রদায়কে সন্ত্রস্ত করে তোলে। পঞ্চাশ জন নাৎসী সেনানায়ক এই চতুর্থ অভিযানের পরিকল্পনা করেছিল এবং তাদেরই নির্দ্দেশানুসারে কুয়োমিন্টাঙ-বাহিনী নব রণ-কৌশলে শিক্ষিত হ'য়েছিল। এ-রকম বিরাট আয়োজন সত্ত্বেও যখন লালফৌজকে পর্য্যুদস্ত করা অসম্ভব হ'ল, তখন চিয়াং-কাইসেকের বিশিষ্ট মন্ত্রণাদাতা হিসাবে নাৎসী সেনানায়ক ফন্ সেক্ট জার্ম্মানী থেকে চীনে আগমন করেন। জার্ম্মানীতে কমিউনিস্ট দমনে ফন্ সেক্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। চীনের বিপ্লবান্দোলনকে গণবিপ্লবের রূপ দেবার জন্যে বিপ্লবী নেতা সুন্ইয়াৎসেনের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন বরোদিন; তিনি এসেছিলেন সোভিয়েট রাশিয়া থেকে। দশ বৎসর পরে চীনের গণ-আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্যে চীনের রাষ্ট্রনেতা চিয়াংকাইসেকের মন্ত্রণাদাতা হ'লেন সেনানায়ক ফন্ সেক্ট; তিনি এলেন নাৎসী জার্ম্মানী থেকে।

চীনে পদার্পণ করে ফন্ সেক্টের প্রধান কাজ হ'ল সোভিয়েট চীনের বিরুদ্ধে পঞ্চম অভিযানের আয়োজন করা। ফন্ সেক্ট জার্ম্মানী থেকে অভিজ্ঞ নাৎসী সেনানায়ক এনে চিয়াংকাইসেকের পঞ্চম অভিযানের জন্যে কুয়েমিন্টাঙ্-এর সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। শুধু যে নাৎসী জার্ম্মানী চিয়াং-কাইসেকের সাহায্যের জন্যে এসেছিল তা নয়; রুশবিপ্লবের পর সোভিয়েটের গৃহশত্রু যুডেনিচ, ডেনিকিন, রাঙ্গেল ও কল্চাক্‌কে সাহায্য করেছিল পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ; চীনের ক্ষেত্রে ও সাম্যবাদী চীনের বিরুদ্ধে চিয়াং-

কাইসেকের সংগ্রামের সাহায্যার্থে এলো বৃটেন, জাপান ও আমেরিকা। নানকিং গভর্ণমেণ্টকে পাঁচ মিলিয়ন পাউণ্ড ধার দিল এবং চিয়াংকাইসেকের পঞ্চম অভিযানের সুবিধার জন্যে ক্যাণ্টন-হ্যাঙ্কাউ রেললাইন সম্পূর্ণ করতে আরম্ভ করল। জাপান ইতিমধ্যে মাঞ্চুরিয়া গ্রাস ক'রে মাঞ্চুকুয়ো সৃষ্টি করেছিল (১৯৩২) এবং চিয়াংকাইসেক মাঞ্চুকুয়ো স্থাপন ১৯৩৩-এ "টাঙ্‌কুট্‌সে" স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরে চীনে তদানীন্তন বৃটিশ প্রতিনিধি স্তর মাইলস্ ল্যাম্প্‌সনের চেষ্টায় নানকিং গভর্ণমেণ্ট ও জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের ভিতর অনেকগুলি চুক্তি সম্পাদিত হয়; এই চুক্তিগুলির মূল কথা হচ্ছে উত্তর চীনে জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনাকে নানকিং গভর্ণমেণ্ট বাধা দেবে না এবং তার বিনিময়ে লালফৌজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নানকিং গভর্ণমেণ্টকে জাপান অর্থ ও রণসম্ভার দিয়ে সাহায্য করবে। আমেরিকা "গম ও তূলার ধার হিসাবে" পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার এবং "বিমান-চালনার ধার" হিসাবে চল্লিশ মিলিয়ন ডলার নানকিং গভর্ণমেণ্টের হাতে দিল। নানকিং গভর্ণমেণ্ট আমেরিকাকে প্রতিশ্রুতি দিল যে, যুদ্ধের সমস্ত বিমানপোত আমেরিকা থেকেই কেনা হবে। ১৯৩৩ ও ১৯৩৪-এর ভিতর চিয়াংকাইসেকের বাহিনীকে শক্তিশালী করবার জন্যে আমেরিকা ও কানাডা থেকে তিন শত বিমানচালক চীনে এসেছিল। এ ছাড়া সাম্যবাদী চীনের বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্যে চিয়াংকাইসেক চীনে আফিম বিক্রী আইনানুমোদিত করলেন; হিসাব করে দেখা গিয়েছিল যে, এ-ভাবে নানকিং গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব-ভাণ্ডারে প্রতি বৎসর দু'শ মিলিয়ন ডলার আসবে।

এ-ভাবে সব দিক দিয়ে সুসজ্জিত হয়ে নয় লক্ষ সৈন্য ও প্রচুর রণসম্ভার নিয়ে চিয়াংকাইসেক আরম্ভ করেন তাঁর পঞ্চম অভিযান। এ-অভিযান চলেছিল ১৯৩৩-এর অক্টোবর থেকে ১৯৩৪-এর অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রধানত কিয়াংসি প্রদেশকে কেন্দ্র করে। এ-অভিযানে সেনানী ও অস্ত্রবলে বলীয়ান কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-বাহিনী নব নব কৌশলে সোভিয়েট চীনকে চতুর্দ্দিক থেকে অবরুদ্ধ করে ঘিরে ফেলে। কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-বাহিনীর আক্রমণ অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিহত

করতে না পেরে লালফৌজ পিছনে হটে যেতে বাধ্য হয়; কিন্তু কোথাও লালফৌজ আত্মসমর্পণ করেনি। কিংয়াসি প্রদেশে লালফৌজের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। চিয়াংকাইসেক আশান্বিত হয়ে ভাবলেন যে, লালফৌজের অন্তিম অবস্থা আগতপ্রায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লালফৌজকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি এবং চিয়াংকাইসেকের পঞ্চম অভিযান অমীমাংসিত থেকে গেল। কিয়াংসি প্রদেশে যখন লালফৌজের অবস্থা সঙ্গীন হ'য়ে ওঠে, তখন স্থইকিনে কমিউনিস্ট সেনানায়কদের এক সামরিক সম্মিলনে লালফৌজকে নতুন ঘাঁটিতে সরিয়ে আনা স্থির হয়। উত্তর-পশ্চিম চীনের সেন্‌সি প্রদেশ হ'ল এই নতুন ঘাঁটি।

এ-স্থলে লালফৌজের শক্তির উৎস ও কিয়াংসি, ফুকিয়েন, হুনান, আনহুই প্রভৃতি স্থানে সোভিয়েটের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। বর্ত্তমানে যখনই কোন দেশে গণতন্ত্রের রক্ষাকল্পে সে-দেশের জনগণ জীবন পণ ক'রে সংগ্রাম করতে আরম্ভ করে, তখনই সাম্রাজ্যতন্ত্রী শক্তিবর্গ তারস্বরে ঘোষণা করতে থাকে—"সোভিয়েট রাশিয়া সাম্যবাদ প্রচারের নতুন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে ঐ দেশকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে।" চীনের লালফৌজ যখন চিয়াং-এর সমস্ত অভিযানকে ব্যর্থ করে দিল, তখন সাম্রাজ্যবাদীদের মুখ থেকে ঐ কথাই নির্গত হয়েছিল; সোভিয়েট রাশিয়া অস্ত্র দিয়ে সোভিয়েট চীনকে সাহায্য করছে। প্রকৃত পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে চীনের লালফৌজ অর্থ বা অস্ত্রশস্ত্র কিছুই পায় নি। লালফৌজ গেরিলা-রণকৌশলের সাহায্যে কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর সৈন্যবাহিনীকে পর্য্যুদস্ত ক'রে তাদেরই অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে সোভিয়েটের জনগণকে সুসজ্জিত করে তুলেছিল। লালফৌজের জয়ের অন্যতম কারণ চীনা সোভিয়েটের সুসংবদ্ধ শক্তি, বৈপ্লবিক প্রগতি ও সোভিয়েটের উপর জনগণের অটুট বিশ্বাস।

১৯৩৪-এর জানুয়ারীতে নিখিল-চীন সোভিয়েট কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় স্থইকিনে। চীন রিপাব্লিকের সভাপতি মাওৎসেতুঙ প্রথম কংগ্রেসের পর থেকে সোভিয়েটের কার্য্যাবলীর এক ইতিহাস প্রদান করেন।

সে-ইতিহাসে দেখা যায় যে, সোভিয়েট-চিহ্নিত দেশগুলিতে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটেছে এবং সমস্ত জমির মালিক হ'য়েছে কৃষকেরা। আর্থিক ও জমি বণ্টনের দিক থেকে সোভিয়েট এতদূর শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছিল যে জনগণের দৃষ্টি সোভিয়েটের কর্ম্মধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। অভিজ্ঞতা দিয়ে চীনের জনগণ বুঝেছিল যে সোভিয়েটই তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র প্রতীক। এমন কি কুয়োমিন্টাঙ্-শাসিত জনপদের জনগণ পর্য্যন্ত সোভিয়েটের কর্ম্মপ্রণালী দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল; তাই তারা বিবিধ উপায়ে লালফৌজকে অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। প্রথম কংগ্রেসের পর থেকে কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সোভিয়েট চীনের অগ্রগতি লক্ষ্য করবার বিষয়। জনগণের ভিতর শিক্ষার বিস্তারকল্পে সহস্র সহস্র সাধারণ ও নৈশ বিদ্যালয় এবং ক্লাবের প্রতিষ্ঠা, মেয়েদের শিক্ষার জন্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব, সিউকিনে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, সর্ব্বত্র পত্রিকার প্রকাশ, বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে থিয়েটার স্থাপন প্রভৃতি সোভিয়েট চীনের জনগণের জীবনে নতুন ঊষার আলো এনে দিয়েছিল। লালফৌজের কাজও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল। ১৯৩১-এর প্রথম কংগ্রেসে সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের "কেন্দ্রীয় বৈপ্লবিক সমরপরিচালনা-সমিতি" স্থাপিত হয়েছিল। ফলে লালফৌজের কর্ম্মাবলী সুনিয়ন্ত্রিত করবার অনেক সুবিধা হয়। এই পরিচালক-সমিতি দিকে দিকে জনগণের মধ্যে লালফৌজের শাখা-প্রশাখা স্থাপন ক'রে লালফৌজকে শক্তিশালী ক'রে তোলে। ১৯৩৩-এ সিউকিনের নিকটেই লালফৌজের কেন্দ্রীয় সামরিক বিদ্যায়তন তিন সহস্র সেনা-নায়কের সৃষ্টি করেছিল। সোভিয়েট চীনকে রক্ষা করবার জন্যে জনগণ স্বতঃ-প্রণোদিত হ'য়ে লালফৌজে যোগদান করেছিল। তাদের জীবনযাত্রা ছিল সহজ ও সরল; তাদের সম্মুখে ছিল এক সুমহান আদর্শ—সোভিয়েট চীনকে বিপদমুক্ত করে বাঁচিয়ে রাখা। সমর-পদ্ধতির দিক থেকে তারা সাধারণত চারটি স্লোগান ব্যবহার করত:—

(১) শত্রু যখন এগুবে, আমরা তখন পিছু হটবো;

(২) যখন শত্রু আসবে এবং বিশ্রাম নেবার সঙ্কল্প করবে আমরা তখন হঠাৎ আক্রমণে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলব ;

(৩) যখন শত্রু এড়িয়ে যেতে চাইবে, আমরা তখন তাদের আক্রমণ করব ;

(৪) যখন শত্রু পিছু হটবে, আমরা তখন তাদের তাড়া করব।

লাল ফৌজের এই জনভিত্তি ও রণকৌশলই চিয়াংকাইসেকের অভিযানের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। তবে চিয়াংকাইসেকের অভিযানের ব্যর্থতার অন্তর্নিহিত আর একটি কারণ, কুয়োমিন্টাঙ-এর সৈন্যবাহিনীর ভিতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি। সোভিয়েটের কর্ম্মপন্থায় কুয়োমিন্টাঙ্-এর সৈন্য-বাহিনী দিন দিন আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল। তাদের ভিতর একটি প্রশ্ন সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়—কেন তারা তাদের নিজেদের ভাইবোনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে? কিসের জন্যে? শুধু মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী জমিদার ও ধনিকের সুবিধার জন্যে নয় কি?—এই রকম ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে কুয়োমিন্টাঙ্-এর অষ্টবিংশ রুট ফৌজ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। চীনের ইতিহাসে এ-বিদ্রোহ নিঙ্টু বিদ্রোহ নামে খ্যাত।

কমিউনিস্টদের দৃষ্টি শুধু সোভিয়েট চীনের উপরই নিবদ্ধ ছিল না। উত্তর চীনে জাপানের অগ্রগতি প্রতিহত না করলে চীনের স্বাধীন অস্তিত্ব যে বিলুপ্ত হবে তা কমিউনিস্টরা বুঝেছিল। তাই চিয়াংকাইসেকের নৃশংস অত্যাচার সত্ত্বেও ১৯৩১-এ জাপানের অগ্রগতি প্রতিহত করতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি চিয়াংকাইসেকের সঙ্গে সহযোগিতা করবার প্রস্তাব করে। ১৯৩২-এ প্রথমে কমিউনিস্টরা সাংহাইতে নানকিং গভর্ণমেণ্টের সৈন্যদলের সঙ্গে একত্র হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চেয়েছিল। কিন্তু চিয়াংকাইসেক কমিউনিস্টদের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি হন নি। তখন চীনের সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (১৯৩২, ফেব্রুয়ারী)। সোভিয়েট চীন তখন কুয়োমিন্টাঙ্-বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ ছিল। সুতরাং -যুদ্ধ ঘোষণায় কার্য্যত জাপানের কোন অসুবিধা হয় নি। অবশ্য কেং-চি-মিং-এর নেতৃত্বে, লালফৌজের একটি শাখা জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে

উত্তর চীন অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিল; কিন্তু পথিমধ্যে চিয়াংকাইসেক কেং-চি-মিংকে কৌশলে বন্দী করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। চিয়াংকাইসেকের নিকট তখন জাপানী আক্রমণকারীর চেয়ে কমিউনিস্টরাই ছিল বড় শত্রু। জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েট চীনের যুদ্ধ ঘোষণার পর কমিউনিস্টরা জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে চীনের সমস্ত সৈন্যবাহিনীর এক সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের জন্যে জনসাধারণ ও সৈন্যদের আহ্বান করে এক প্রচার-পত্রিকা প্রকাশ করে। ১৯৩৩-এর প্রারম্ভে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করল যে, গৃহযুদ্ধ এবং সোভিয়েট ও লালফৌজের বিরুদ্ধে অভিযানের বিরতি, জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সংরক্ষণ এবং জাপ-বিরোধী যুদ্ধে জনগণকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করবার ভিত্তিতে যে-কোন শ্বেতবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট প্রস্তুত।

১৯৩৪-এ পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করে সোভিয়েটের রাষ্ট্রনেতা ও লালফৌজের সেনানায়কেরা উত্তর-পশ্চিম চীনের শেনসি প্রদেশে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের রাষ্ট্রকেন্দ্র সরিয়ে আনবার সিদ্ধান্ত করে। এ-সিদ্ধান্তের কারণ, প্রথমত চিয়াংকাইসেকের পঞ্চম অভিযানের ফলে উদ্ভূত কিয়াংসি প্রদেশে লাল-ফৌজের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা থেকে মুক্তিপ্রয়াস এবং দ্বিতীয়ত উত্তর চীনে জাপানের অগ্রগতি প্রতিহত করবার আকাঙ্ক্ষা। কিয়াংসি প্রদেশে লালফৌজের অবস্থা আদৌ অনুকূল ছিল না। অক্ষত অবস্থায় রণসম্ভার ও সৈন্য নিয়ে পশ্চাদপসরণ করাই ছিল তখন শ্রেষ্ঠ রণনীতি; আর জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হ'লে উত্তর চীনে সামরিক কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। এই দুই দিক বিবেচনা ক'রে সোভিয়েট-নেতারা উত্তর-পশ্চিম চীনে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সরিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু এ কাজ সহজে হয় নি। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সরিয়ে আনার অর্থ দক্ষিণ চীনের সোভিয়েট-চিহ্নিত প্রদেশ-সমূহের লালফৌজ, জনসাধারণ, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরিয়ে আনা—সংক্ষেপে নব প্রদেশ অভিমুখে একটি জাতির অভিযান। এ-অভিযানের পথে বিঘ্ন প্রচুর। সোভিয়েটগুলি তখন কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ

ছিল। কিয়াংসি প্রদেশেই লালফৌজের প্রধান অংশ কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-বাহিনীর তীব্রতা অনুভব করছিল। এমতাবস্থায় শত্রুর ব্যূহ ভেদ ক'রে একটি জাতির পশ্চাদপসরণ যে বিপদসঙ্কুল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কমিউনিস্ট-দের দৃঢ় সঙ্কল্পই সমস্ত বাধাবিঘ্ন অপসারিত করে দিয়েছিল। লালফৌজের প্রধান অংশ, সহস্র সহস্র কৃষকদের এ বিরাট অভিযান আরম্ভ হয় ১৯৩৪-এর ১৬ই অক্টোবর। কৃষকদের ভিতর ছিল বৃদ্ধ, যুবা, নারী, পুরুষ ও শিশু এবং সঙ্গে ছিল ভারবাহী জন্তুর পিঠে কারখানার যন্ত্রপাতি ও মূল্যবান সামগ্রী। ১৯৩৫-এর অক্টোবরে চীনা সোভিয়েট দক্ষিণ চীন থেকে শেচুয়ান আর কান্‌সু প্রদেশ পার হ'য়ে ১৮৮৮ লি (তিন লি'তে এক মাইল) বা ৬০০০ মাইল রাস্তা অতিক্রম ক'রে শেনসি প্রদেশে এসে অধিষ্ঠিত হ'ল। দক্ষিণ চীন থেকে শেনসিতে আসতে চীনা-সোভিয়েট ও লালফৌজের ৩৬৮ দিন লেগেছিল। এই ৩৬৮ দিনের এমন একটি দিনও ছিল না যে-দিন লালফৌজকে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয় নি। সর্ব্বসমেত তুষারাবৃত আঠারটি পর্ব্বতমালা ও চব্বিশটি নদ-নদী তারা অতিক্রম করেছিল। তারা অগ্রসর হয়েছিল বারটি বিভিন্ন প্রদেশের মধ্য দিয়ে—পথিমধ্যে তারা বাষট্টি নগর অধিকার এবং দশটি প্রদেশের সামন্ততন্ত্রের সৈন্যদের পর্য্যুদস্ত করেছিল। এ ছাড়া সর্ব্বদাই কুয়োমিন্‌টাঙ-এর সৈন্যদের পরাস্ত করে তাদের অভিযানের পথ প্রশস্ত করতে হয়েছিল। চীনের দুর্দ্ধর্ষ আদিম অধিবাসীদের অধিকারস্থ ছয়টি শহরের মধ্য দিয়েও তাদের যেতে হয়েছিল; এ শহরগুলিতে দীর্ঘকাল যাবৎ কোন চীনা বাহিনী প্রবেশ করতে পারে নি। এ-ভাবে শত দুঃখ-কষ্ট বরণ করে সোভিয়েট চীনের জনগণ ও লালফৌজ তাদের গন্তব্য স্থানে এসে পৌছল। ইতিহাসে এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল—এর কাছে হ্যানিবলের আল্‌স্‌ অতিক্রম প্রহসন মনে হয়। বিপ্লবী চীনের ইতিহাসে এ অভিযান দীর্ঘ অভিযাত্রা (Long March) বা চাঙ্‌চেঙ্‌ নামে প্রসিদ্ধ।

লালফৌজ শুধু ৬০০০ মাইল অতিক্রম করেই তাদের গন্তব্য স্থানে এসে পৌছায় নি—পথিমধ্যে তারা চীনের জনগণের ভিতর কমিউনিজ্‌মের বাণী

প্রচার করতে করতে এসেছে। বিশ কোটী চীনবাসীর ভিতর দিয়ে পথ করে তারা এসেছে যুদ্ধ করতে করতে। যেখানেই তারা নতুন শহর বা গ্রাম অধিকার করেছে সেখানেই বড় বড় সভার ব্যবস্থা করে কমিউনিজ্‌মের আদর্শ, সোভিয়েটের কর্ম্মপন্থা, সোভিয়েট শাসন-ব্যবস্থার মূল নীতি, কৃষক-আন্দোলনের তাৎপর্য্য, কৃষকদের ভিতর সোভিয়েট কি রকম ভাবে জমি বণ্টন করে দিয়েছে, চীনকে জাপানের খপ্পর থেকে রক্ষা করবার জন্য সোভিয়েটের কর্ম্মধারা—এ সকল বিষয় পরিষ্কার ভাবে জনগণকে বুঝিয়ে দিয়ে তাদের সোভিয়েটের দিকে টেনে এনেছে। শুধু এই নয়, ঐ সব স্থানে ধনীদের শোষণব্যবস্থা ও দাসপ্রথার অবসান ঘটিয়েছে, জমিদারদের জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য শত শত কৃষককে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করেছে।

লালফৌজের এ অভিযান দেখে মনে হয়, এ অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সম্ভব হল কি করে? এর প্রথম কারণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব, দ্বিতীয় কারণ সোভিয়েট জনগণের অদ্ভুত কৌশল, অনমিত তেজ ও সাহস, সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও বৈপ্লবিক প্রেরণা।

উত্তর-পশ্চিম চীনে কমিউনিষ্টরা ও চাঙ সুয়েহলিয়াঙ

বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধে চীনে জাপানের অত্যাচার উৎপীড়নের বীভৎস নগ্ন রূপ দেখে জগৎবাসী আজ স্তম্ভিত। কিন্তু অত্যাচার উৎপীড়নের এ দৃশ্য চীনে অভিনব নয়; জাপানীরা চিয়াংকাইসেকের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে মাত্র চীনে সাম্যবাদ ধ্বংসকল্পে সোভিয়েট চীনের জনসাধারণও তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন চীনের জনগণের উপর চিয়াংকাইসেক যে নৃশংস অত্যাচারের অবতারণা করেছিলেন ইতিহাসে তার পুনরাবৃত্তি জাপানীরাই চীনে করেছে। চিয়াংকাইসেকের পাঁচটি অভিযানের ফলে সোভিয়েট চীনের জন-সংখ্যা ছ'লক্ষ

কমে গিয়েছিল। চিয়াংকাইসেকের অনুচরেরা সোভিয়েটের সহস্র সহস্র শিশুকে হ্যাঙ্কাউ ও অন্যান্য শহরের ফ্যাক্টরীর মালিকদের কাছে, সহস্র সহস্র তরুণীকে গণিকালয়ের স্বত্বাধিকারীর নিকট বিক্রয় করেছে। সোভিয়েটের যে-জনপদে চিয়াংকাইসেকের সেনানী মুহূর্তের জন্য প্রবেশ করেছে, সে-জনপদকে শ্মশানে, মরুভূমিতে পরিণত ক'রে তারা ফিরে এসেছে। যেখানে এই সেনানী গিয়েছে সেখানে প্রথমে তাদের দৃষ্টি পড়েছে মেয়েদের উপর—মেয়েদের ভিতর যাদের বব্ (bobbed) করা চুল ও স্বাভাবিক পা দেখেছে তাদের উপর প্রথমে করেছে পাশবিক অত্যাচার, তারপর কমিউনিস্ট ব'লে হত্যা করেছে গুলি ক'রে, কিন্তু যাদের ছোট পা ও মুক্ত বেণী দেখেছে তাদের নিজেদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করবার জন্য ভাগ করে নিয়েছে। সে-কাহিনীর ইতিবৃত্ত স্থানাভাবে এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, তবে দু' একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখও প্রয়োজন।

—"১৯৩৩-এর জুন-জুলাই। চিয়াংকাইসেকের সৈন্যদল স্ওউন্-চাই শহরটি কয়েক ঘণ্টার জন্য অধিকার করে। লালফৌজের আগমনে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই কয়েক ঘণ্টার ভিতরই তারা ঐ শহরটিকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। লালফৌজ যখন এসে উপস্থিত হ'ল তখন ঐ শহরে মাত্র কয়েকজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা জীবিত ছিল। সেই জীবিতদের ভিতর কয়েকজন বৃদ্ধ লালফৌজের সেনানায়কদের নিয়ে গেল নিকটবর্ত্তী এক উপত্যকায়; সেখানে সূর্য্যের আলোতে পড়ে রয়েছে অৰ্দ্ধনগ্ন অবস্থায় সতেরটি তরুণীর মৃতদেহ। প্রথমে চলেছে তাদের দেহের উপর অমানুষিক বর্ব্বরোচিত অত্যাচার; পরে তাদের হত্যা করে চিয়াং-এর অনুচরেরা পলায়ন করেছে।

মা চেঙ শহরে চিয়াংকাইসেকের সৈন্যদল পালিয়ে যাবার পর যখন লাল-ফৌজ এল তখন তারা সেই পুরাতন দৃশ্য-ই দেখ্‌ল।—মাঠের ভিতর পড়ে রয়েছে বার জন কমিউনিস্টের মৃতদেহ বিকৃত অবস্থায় ··· দেহ থেকে চামড়া ছাড়ে নেওয়া, চোখ উঠানো।

হুয়াংকাঙ-এ লালফৌজ এসে দেখ্‌ল, চারশত নরনারীর মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে; দেখে মনে হ'ল কিছু সময় পূর্ব্বেই তাদের হত্যা কর হয়েছে।—"

এ রকম দৃষ্টান্ত অগণিত। কিন্তু তবুও সাম্যবাদী চীনকে জয় কর চিয়াংকাইসেকের জীবনে সম্ভব হয় নি। অত্যাচার, উৎপীড়নে কমিউনিস্টর বিচলিত হয় নি, তাদের আদর্শকে জয়যুক্ত করতে তারা দৃঢ়তার সঙ্গে বীরে মত বন্ধুর দুর্গম পথে অগ্রসর হয়েছে।

উত্তর-পশ্চিম চীনের শেনসি প্রদেশে অধিষ্ঠিত হ'য়ে কমিউনিস্টরা জাপানে অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করবার সিদ্ধান্ত করল। কিন্তু চিয়াংকাইসেকের জন্য এ সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী ক'রতে কমিউনিস্টরা সমর্থ হয়নি। শেনসিতে চিয়াংকাইসেক কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। জাপানীদের উত্তর চীন অভিমুখে অগ্রগতি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন কমিউনিস্টরা তখন দু'টি কর্ত্তব্য সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেছিল। প্রথমত কুয়োমিন্‌টাঙ্‌-এর আক্রমণ থেকে সোভিয়েট চীনকে বাঁচানো এবং সঙ্গে সঙ্গে জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন; দ্বিতীয়ত, শেনসি ও তার পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে সোভিয়েটের আদর্শ প্রচার করে জনগণকে কমিউনিজমের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করা এবং জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য উত্তর-পশ্চিম চীনের দুদ্ধর্ষ মুসলমানদের নিজেদের দিকে টেনে আনা।

উত্তর-পশ্চিম চীনে অধিষ্ঠিত হ'য়ে কমিউনিস্টরা চীনে সোশালিজ্‌মে ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হ'ল। দক্ষিণ চীনে, বিশেষ করে কিয়াংশি প্রদেশে অবস্থান কালে সোশালিজ্‌মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ ও অবস কমিউনিস্টদের ছিল না; সোভিয়েটের অস্তিত্ব রক্ষার্থে তখন তাদে কুয়োমিন্‌টাঙ-এর সৈন্যদলের সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম করতে হয়েছিল আর তখন তারা সোশালিজ্‌ম্‌ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে বিপ্লবকে চীনের সর্ব্ব ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করবার কার্য্যেই ব্যাপৃত ছিল। উত্তর চীনে এসে কমিউনিস্টরা তাদের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করবার অনেক সুযোগ-সুবিধ

পেল। ইতিমধ্যে চীনের প্রায় সর্ব্বত্রই বিপ্লবান্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু উত্তর চীনের আভ্যন্তরিক আর্থিক, রাজনৈতিক অবস্থা ও সংস্কৃতি তখন এত অনুন্নত যে, সোশালিস্ট অর্থনীতির কথা উত্থাপন করাও কমিউনিস্টদের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। কমিউনিস্টদের কর্ত্তব্য—সর্ব্বদা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার। সুতরাং উত্তর চীনে সোশালিজ্‌মের আশু প্রবর্ত্তনের চেষ্টা না করে তৎকালীন সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া কমিউনিস্টরা যুক্তিযুক্ত মনে করল। উত্তর চীনের প্রদেশগুলি ছিল প্রধানত কৃষিপ্রধান—সামন্ত-ব্যবস্থার চিহ্ন তখনো সেখানে পরিস্ফুট। সুতরাং ভূমিস্বত্ব ও ট্যাক্স সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধানে কমিউনিস্টরা ব্রতী হল; কৃষকদের ভিতর জমি বণ্টন ও জমিদারদের ট্যাক্স থেকে কৃষকদের মুক্ত করাই ছিল তখন প্রধান কাজ। চীনের কমিউনিস্টদের এ-কর্ম্মপদ্ধতি রাশিয়ার নারড্‌নিক-দের (Narodnik) প্রতিক্রিয়াশীল কর্ম্মপদ্ধতির ন্যায় মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কৃষকদের ভিতর জমি বণ্টনই কমিউনিস্টদের প্রধান লক্ষ্য ছিল না—চীনে সোশালিজ্‌ম্‌ প্রতিষ্ঠাকল্পে কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন শুধু একটি মাত্র পন্থা, যার ফলে সহস্র সহস্র কৃষককে সোভিয়েটের পতাকাতলে সমবেত করা গিয়েছিল। কমিউনিস্ট-দের লক্ষ্য। চীনে মার্ক্‌স্‌-লেনিন-বিবৃত সোশালিস্ট রাষ্ট্রের সংস্থাপন—এ-কথা সুস্পষ্টভাবে ১৯৪১-এর নিখিল-চীন-সোভিয়েট কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনেই ঘোষিত হয়েছিল।

কমিউনিস্টদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফলে ধীরে ধীরে উত্তর চীনে, বিশেষ করে, শেনসিতে সোভিয়েট শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হল। সোভিয়েট গ্রামগুলি গণ-তান্ত্রিক অধিকার পেয়ে সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াল। সাধারণ শিক্ষা, কৃষি-শিক্ষা, যুদ্ধবিদ্যা, রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রসার, লালফৌজের বিস্তৃতি প্রভৃতির জন্য সোভিয়েটের সর্ব্বত্র বিভিন্ন প্রকার সমিতির আবির্ভাব—উত্তর চীনের কৃষকদের জীবনে এক নব যুগের সূচনা করেছিল।

উত্তর চীনে সোভিয়েট শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টরা জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে উত্তর চীনের এক কোটী দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান জনগণকে

নিজেদের দিকে আনবার চেষ্টা করছিল। মুসলমানদের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রচারকার্য্যের ফলে অনেক মুসলমান যুবক কমিউনিস্ট ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। ১৯৩৬-এর প্রথম ভাগে যখন লালফৌজ নিঙশিয়া এবং কানসু প্রদেশ অতিক্রম করে পীত নদী অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল তখন ঐ দুই প্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে তারা তাদের আদর্শকে ভালোভাবে প্রচার করেছিল এবং কুয়োমিন্‌টাঙ ও চিয়াং কাইসেকের যথার্থ রূপ তাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করেছিল। লালফৌজ মুসলমানদের প্রধানত এই সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল:

(১) অতিরিক্ত ট্যাক্স বন্ধ করা;

(২) স্বয়ংশাসিত "(Autonomous)" মোস্‌লেম গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা;

(৩) বাধ্যতামূলক সেনা সংগ্রহের (Conscription) অবসান ঘটানো;

(৪) কৃষক ও শ্রমিকদের সমস্ত দেনা বাজেয়াফ্‌ত করা;

(৫) মোস্‌লেম সংস্কৃতিকে রক্ষা করা;

(৬) সকলকে ধর্ম্মের স্বাধীনতা দেওয়া;

(৭) জাপবিরোধী মোস্‌লেম সৈন্যবাহিনী গঠনে সাহায্য করা;

(৮) সমগ্র চীনের, বহির্মঙ্গোলিয়া, সিংকিঙ ও সোভিয়েট রাশিয়ার সমস্ত মুসলমানদের একত্রিত করতে সাহায্য করা।

এই প্রতিশ্রুতিগুলিকে কার্য্যকরী করতে কমিউনিস্টদের আন্তরিক চেষ্টা উত্তর চীনের মুসলমানদের মুগ্ধ করেছিল। ফলে মুসলমানেরা কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগ স্থাপনে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। ১৯৩৬-এর মে মাসের মধ্যে তারা মুস্‌লিম লালফৌজ গঠন করে তোলে। কমিউনিস্টদের কর্ম্মধারা দেখে মুসলমান জনগণ এমন আকৃষ্ট হয়েছিল যে, তখন তারা বলতো—"আমাদের শত্রু জমিদার, ধনিক, অত্যাচারী শাসক ও শোষক সম্প্রদায় এবং জাপানীরা। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য চীনের বিপ্লবান্দোলনকে সার্থক করা ··· মুসলমান জমিদার ও ধনিক অন্যান্য চীনা জমিদার ও ধনিকদের মতই অত্যাচারী। ··· নিষ্ঠুর শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম—তা

তারা হোক না মুসলমান। চীন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ও কমিউনিস্টরাই আমাদের মিত্র ... ”

১৯৩৬-এর জুলাইর মধ্যে মুসলমান জনগণের ভিতর কমিউনিস্টদের কাজ এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে, নিঙশিয়া প্রদেশের মুসলমানগণ গ্রামে গ্রামে তাদের সোভিয়েট স্থাপন করেছিল এবং উওয়াঙ পাও-তে সোভিয়েট স্থাপন উদ্দেশ্যে তথাকার মুসলমান জনসাধারণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে প্রতিনিধিও পাঠিয়েছিল। ঐ বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে নিঙশিয়া-তে সেখানকার সোভিয়েট গ্রাম হ'তে নির্ব্বাচিত তিন শত প্রতিনিধি এ-সম্মেলন আহ্বান করেন এবং সে-সম্মেলনে একজন সভাপতি নির্ব্বাচন ক'রে তারা অস্থায়ী মোস্‌লেম সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করলেন। লালফৌজের সঙ্গে সহযোগিতা করে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য জাপ-বিরোধী মোস্‌লেম সৈন্যবাহিনী গঠনের প্রস্তাব সেই সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য। এ-ভাবে অতি অল্পকালের ভিতর কমিউনিস্ট ও মুসলমানদের ভিতর মৈত্রী স্থাপনও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

* * * *

উত্তর চীনে যখন কমিউনিস্টরা সব দিক দিয়ে শক্তিশালী হ'য়ে উঠছিল তখন চীনের বুক থেকে কমিউনিজ্‌ম্ উচ্ছেদ করবার ভার ছিল চাঙস্যুয়েহলিয়াঙ ও তাঁর তুঙপেই বাহিনীর উপর (উত্তর-পূর্ব্ব চীনের সৈন্যবাহিনী তুঙপেই বাহিনী নামে খ্যাত)।

১৯৩১ সালে চাঙ-স্যুয়েহলিয়াঙ ছিলেন মাঞ্চুরিয়ার অধীশ্বর। মাঞ্চুরিয়ার শাসনকর্ত্তৃত্ব তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর পিতার নিকট থেকে পেয়েছিলেন। তবে তিনি মাঞ্চুরিয়ার উপর নানকিং গভর্ণমেণ্টের আধিপত্য স্বীকার করে-ছিলেন। ১৯৩১-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর যখন জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে চাঙ তখন পিপিং-এর হাসপাতালে শয্যাশায়ী। মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের সংবাদ চাঙ্‌কে ব্যাকুল ক'রে তোলে। একটু সুস্থ হ'য়ে রুগ্ন দেহ নিয়ে নানকিং-এ এসে তিনি জাপানের আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে চিয়াংকে অনুরোধ করেন। চিয়াং-এর মস্তিষ্কে তখন কমিউনিজ্‌ম্ ধ্বংসের পরিকল্পনা জটিল আকার ধারণ

করেছিল; জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার কথা তিনি চিন্তাই করতে পারতেন না। কমিউনিজ্‌ম্‌ ধ্বংসের অভিযানে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্র তাঁর প্রধান সমর্থক ও সাহায্যকারী; মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রে জাপানের সঙ্গে বৈরিতা করা চিয়াং-এর পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। সুতরাং, চিয়াং চাঙ্‌কে প্রতিরোধের কল্পনা থেকে বিরত হ'য়ে ইউরোপে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট অভিযোগ জানাবার উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন। অনভিজ্ঞ চাঙ্‌ সে-উপদেশ শিরোধার্য্য ক'রে হারালেন তাঁর স্বদেশ—মাঞ্চুরিয়া। তখন চাঙের তুঙপেই বাহিনী মাঞ্চুরিয়া থেকে চীনে আসতে বাধ্য হ'ল। মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করে জাপান যখন অন্তোর্মঙ্গোলিয়ার জেহোল প্রদেশ অধিকারে উদ্যত হ'ল, তখন চাঙ জাপানের অগ্রগতি প্রতিহত করতে চিয়াংকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে অনুরোধ করেন এবং নিজে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'লেন। কিন্তু চিয়াং-এর নীতি তখনও অপরিবর্ত্তিত—চাঙ্‌কে যুদ্ধোদ্যম থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়ে জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ তিনি বিঘ্নমুক্ত ক'রে দিলেন। সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে চাঙ তখন ইউরোপ ভ্রমণে বের হ'লেন। ১৯৩৪-এ চাঙ যখন ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন তখন তিনি একজন নতুন মানুষ—জাপানের আক্রমণ-প্রতিরোধ, তাঁর স্বদেশ মাঞ্চুরিয়ার পুনরুদ্ধারই তাঁর জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু চিয়াংকে তখনও তিনি চেনেন নি, চিয়াং-এর উপর তখনও তাঁর অটুট বিশ্বাস। চিয়াং তাঁকে বুঝালেন যে, জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ করাই নানকিং গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য, তবে বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বে গৃহশত্রুর ধ্বংস সাধন প্রয়োজন এবং সে-জন্যই তাঁর কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান। চিয়াং-এর বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে চাঙ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযানে চিয়াং-এর দক্ষিণ হস্ত হ'য়ে দাঁড়ালেন। সামরিক ক্ষেত্রে তখন চিয়াংকাইসেকের পরেই চাঙ-সুয়েহলিয়াঙের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। ১৯৩৫-এ যখন উত্তর চীনের হোপেই ও চাহার অঞ্চলে জাপান অবাধে আধিপত্য বিস্তার ক'রল, তখন চাঙের তুঙপেই বাহিনীর ভিতর অসন্তোষের সৃষ্টি হ'ল। এই অসন্তোষ অধিকতর প্রবল হ'য়ে ওঠে

চিয়াং-এর নির্ব্বুদ্ধিতায়—উত্তর চীনে লালফৌজকে পর্য্যুদস্ত করার কাজে তিনি চাঙ-এর অধিনায়কত্বে তুঙপেই বাহিনীকেই নিযুক্ত করলেন। দক্ষিণ চীনে সোভিয়েট ও লালফৌজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানে চাঙ ও তাঁর তুঙপেই বাহিনীর সেনানায়কদের নিকট দু'টি জিনিস প্রতিভাত হয়েছিল—প্রথমত কমিউনিস্টদের জাপ-বিরোধী মনোভাব; দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েট ও লালফৌজের ধ্বংস সাধন দীর্ঘকালের কাজ। অন্যদিকে লালফৌজের প্রচারকার্য্যের ফলে তুঙপেই বাহিনী দিন দিন লালফৌজের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। তুঙপেই সৈন্যদল কিছুতেই ভুলতে পারছিল না যে, তাদের স্বদেশ মাঞ্চুরিয়া জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের করতলগত। লালফৌজের জাপ-বিরোধী আন্দোলন তাদের আকৃষ্ট করেছিল; চাঙ-এর চিত্তও তখন দোদুল্যমান। কিন্তু এ-অবস্থা সত্ত্বেও চাঙ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চিয়াং-এর ষষ্ঠ অভিযানের সেনাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে তুঙপেই বাহিনী নিয়ে উত্তর-পশ্চিম চীনের সিয়ানফু-তে এসে উপস্থিত হলেন। সিয়ানফু তে সামরিক কেন্দ্র স্থাপন করে চাঙ লালফৌজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করলেন; কিন্তু সে-সংগ্রামে রণচাতুর্য্যে লালফৌজ তুঙপেই বাহিনীকে সর্ব্বত্র পর্য্যুদস্ত করে। চাঙ-এর যে-সকল সৈন্য লালফৌজ যুদ্ধে বন্দী করত, তাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার না করে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিউনিস্টরা যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এ-কথা বুঝিয়ে চাঙ-এর নিকট পাঠিয়ে দিত। ফলে যখন ঐ সকল বন্দী সৈনিকেরা মুক্ত হ'য়ে চাঙ-এর নিকট ফিরে আসত, তখন তারা সোভিয়েট শাসন-ব্যবস্থা ও কমিউনিস্টদের প্রশংসাই করত। ঐ সকল মুক্ত সৈনিকদের মুখে লালফৌজের চীনে অন্তর্বিরোধের অবসান ঘটিয়ে জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়ে চীনকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা শুনে চাঙ মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। লালফৌজ চাঙ ও তুঙপেই বাহিনীকে মাত্র দু'টি শ্লোগান দিয়ে জয় করেছিল—

১। চীনারা চীনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না;

২। আমাদের সঙ্গে এক হও এবং জাপানের হাত থেকে মাঞ্চুরিয়া উদ্ধার কর।

এ দু'টি স্লোগানের সত্যতা ও লালফৌজের আন্তরিকতা সম্বন্ধে চাঙ ও তাঁর সৈন্যদের কোন সংশয় ছিল না। ইতিমধ্যে আর এক দিক দিয়েও চাঙ কমিউনিস্টদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জাপানের মাঞ্চুকুয়ো স্থাপনের পর চাঙ-এর 'তুঙপেই' বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র সিয়ান-এ এসে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে থাকে এবং এদের ভিতর অধিকাংশ ছিল কমিউনিস্ট। তাদের আলাপ-আলোচনা এবং জাপ-বিরোধী কার্য্যকলাপে চাঙ মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। এ-সময়, ১৯৩৬-এর প্রারম্ভে পাদ্রী ওয়াঙ-এর চেষ্টায় চাঙ ও চীন-সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের ভিতর এক মৈত্রী-সূত্র স্থাপিত হল। ওয়াঙ শেনসিতে সোভিয়েট রাষ্ট্রকেন্দ্র ইয়েনান-এ গিয়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে সিয়ান-এ ফিরে আসেন; পরে চাঙ স্বয়ং ইয়েনান-এ যান; সেখানে লালফৌজের অন্যতম সেনানায়ক চু-এন-লাই-এর সঙ্গে চাঙের আলাপ-আলোচনা হয়। জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ-কল্পে কমিউনিস্টদের দৃঢ়তায় নিঃসংশয় হ'য়ে চাঙ কমিউনিস্টদের সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ফলে তুঙপেই-কমিউনিস্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল—জাপ-আক্রমণের প্রতিরোধই সে-চুক্তির মূল কথা। সে-চুক্তির পরে তুঙপেই বাহিনীর জীবনযাত্রার বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে। সিয়ানে লালফৌজের প্রতিনিধিরা এসে "তুঙপেই" সৈন্যের পোসাক পরে চাঙের সৈন্যদের রণকৌশলে পারদর্শী করবার ভার গ্রহণ করেছিল। সৈন্যদের রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকার ক্লাসের ব্যবস্থা, তুঙপেই সৈন্যবাহিনীর ভিতর জাপ-বিরোধী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা কমিউনিস্টদের প্রচেষ্টার ফল। কমিউনিস্টদের কার্য্যকলাপে মুগ্ধ হ'য়ে চাঙ তুঙপেই বাহিনীর পরিচালনার সমস্ত ভার কমিউনিস্টদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু চাঙ ও তুঙপেই বাহিনীর এই নতুন কর্ম্মপ্রণালী খুব গোপনে চলেছিল। কারণ, নানকিং গভর্ণমেণ্টের সৈন্যদল সান্‌শি-শেনশি সীমান্তে, কান্‌সু এবং নিঙশিয়াতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিযুক্ত ছিল।

অন্যদিকে তখন জাপানের আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্য চীনের সর্ব্বত্রই সাড়া পড়েছিল। ১৯৩৪-এর আগস্ট মাসে মাদাম সুন্-ইয়াৎ-সেন প্রমুখ

তিন শত দেশপ্রেমিক এক ইস্তেহারে কমিউনিস্টদের 'সম্মিলিত ফ্রণ্ট' গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। ১৯৩৬-এর জুন মাসে কুয়োমিন্টাঙ্-এর বামপন্থী দল অন্যান্য জাপ-বিরোধী সমিতিগুলির সঙ্গে একত্রিত হয়ে সম্মিলিত ফ্রণ্টের ভিত্তিতে নিখিল-চীন-জাতীয়-মুক্তিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল অন্তর্বিরোধের অবসান ঘটিয়ে জাপানের আক্রমণ থেকে চীনকে বাঁচানো। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে চিয়াং প্রথম সিয়ানে আসেন। চাঙ তখন চিয়াং-এর নিকট সম্মিলিত জাতীয় ফ্রণ্ট গঠন করে জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ ও সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপনের প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন। চিয়াং তাঁর চিরাচরিত প্রথায় উত্তর দিলেন—"আমি এ-সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করব না যে-পর্য্যন্ত না চীন থেকে লালফৌজের প্রত্যেকটি সৈন্যের উচ্ছেদ হয় এবং সমস্ত কমিউনিস্টদের বন্দী করা যায়।" চিয়াং-এর এই উদ্ধত জবাবে চাঙের নিকট নানকিং গভর্ণমেণ্টের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। এর কিছু কাল পরে আর একটি ঘটনায় চাঙ চিয়াং-এর উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। সে-ঘটনা ঘটেছিল জাতীয় মুক্তিসঙ্ঘকে কেন্দ্র করে। কমিউনিস্টদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেয়ে জাতীয় মুক্তিসঙ্ঘের নেতৃবৃন্দ জাপ-বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী ও তীব্রতর করে তুলছিলেন—চীনের সর্ব্বত্র জাতীয় মুক্তি-সঙ্ঘের শাখা-প্রশাখা স্থাপিত হয়েছিল। জাতীয় মুক্তিসঙ্ঘের প্রসারে সন্ত্রস্ত হ'য়ে জাপ গভর্ণমেণ্ট চিয়াং-এর নিকট জাতীয় মুক্তিসঙ্ঘের উচ্ছেদের দাবী জানাল। জাপানের এ-দাবী স্বীকার ক'রে নিয়ে চিয়াংকাইসেক ১৯৩৬-এর নভেম্বর মাসে জাতীয় মুক্তি-সঙ্ঘকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করেন এবং সঙ্ঘের সাত জন নেতাকে গ্রেফ্তার করেন। জাতীয় মুক্তিসঙ্ঘের চোদ্দখানা জাতীয় পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হল। এ ছাড়া জাপানের সন্তুষ্টির জন্য কুয়োমিন্টাঙ্-এর সৈন্য দিয়ে সাংহাইতে জাপানী মিলের শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট তিনি ভেঙ্গে দিলেন।

এ সকল ঘটনা তুঙপেই সৈন্যদের চঞ্চল করে তুলেছিল। দিনের পর দিন তারা চিয়াং-এর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। জাতীয় মুক্তি-সঙ্ঘের উপর

দমননীতি প্রয়োগে তুঙপেই সৈন্যরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্য্যন্ত তারা চাঙকে এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতে বাধ্য করল। চাঙ সমস্ত সৈন্যদের মনোভাব জানিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অনুমতির জন্য চিয়াং-এর নিকট আবেদন করে পাঠালেন। কিন্তু চিয়াং তাঁর সঙ্কল্পে অটল; জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবার আদেশ তিনি চাঙকে দিলেন। চিয়াং তখন লয়াঙে ছিলেন। জাতীয় মুক্তিসঙ্ঘের কারারুদ্ধ নেতাদের মুক্তির দাবী নিয়ে চাঙ লয়াঙে এসে উপস্থিত হলেন। চিয়াং সে-দাবী উপেক্ষা করে চাঙকে বললেন যে,তিনি স্বয়ং সিয়ানে গিয়ে সৈন্যদের সম্মুখে তাঁর কর্ম্মপন্থার ব্যাখ্যা করবেন। ক্ষুব্ধ হয়ে চাঙ সিয়ানে ফিরে এলেন এবং চিয়াং-এর আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সিয়ানে চিয়াং-এর দ্বিতীয় বার আগমনের পূর্ব্বে আরো দু'টি ঘটনা ঘটে, যার ফলে তুঙপেই সৈন্যরা প্রকাশ্যে চিয়াং-এর বিরোধী হয়ে ওঠে। প্রথমত জাপ-জার্মান কমিনটার্ন বিরোধী চুক্তি সম্পাদন এ-সময় হয়েছিল এবং ইতালীর সে-চুক্তিতে সম্মতি ছিল। পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ইতালী জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার এবং জাপানও ইতালীর আবিসিনিয়া বিজয় স্বীকার করে নিয়েছিল। মাঞ্চুকুয়োর সঙ্গে ইতালীর সম্বন্ধ স্থাপনের সংবাদ শুনে চাঙ চীনে ইতালীর প্রভাব বিনষ্ট করবার প্রতিজ্ঞা করলেন এবং তাঁর সৈন্যদের সম্মুখে ঘোষণা করলেন—"চীনে ফাশিস্ট আন্দোলনের সমাপ্তি এইখানেই।" চাঙ-এর অভিযোগের সঙ্গে তাঁর সৈন্যেরা আর একটি অভিযোগ এনে উপস্থিত করল। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় চিয়াং-এর মন্ত্রণাদাতা ও সৈন্য-পরিচালক ছিল জার্মান ও ইতালীয়ান সেনানায়কেরা। চাঙ-এর সৈন্যদল তাঁকে প্রশ্ন করল—"কুয়োমিনটাঙ-এর ঐ সকল জার্মান ও ইতালীয়ান মন্ত্রণাদাতা ও চিয়াং-এর সৈন্য-পরিচালকগণ কি জাপ-জার্মান চুক্তির পর চীনের আভ্যন্তরীণ সকল সংবাদ জাপ-গভর্ণমেণ্টকে দিচ্ছে না?" … "জাপ-জার্মান চুক্তির কথা কি চিয়াং-কাইসেককে পূর্ব্বেই জানানো হয়নি এবং তিনি কি এ-চুক্তি অনুমোদন করেন নি?" …

সৈন্যদের ভিতর তখন জনরব যে, চিয়াং-এর জ্ঞাতসারেই সব ঘটছে, কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম আরম্ভ করতে তিনি স্বীকৃত নন।

দ্বিতীয়ত, এই সময়েই, ১৯৩৬-এর নভেম্বর মাসের শেষের দিকে, লালফৌজের নিকট কুয়োমিনটাঙ-এর সেনানায়ক হুংস্যুঙ-নান-এর পরাজয় ঘটে। লালফৌজের নিকট দিনের পর দিন পরাজিত হয়েও তাদের বিরুদ্ধে বাহিনীর পর বাহিনী প্রেরণ, অথচ জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে কোন ব্যবস্থা না করা—এ-পন্থা তুঙপেই বাহিনীর নিকট খুব বিসদৃশ মনে হয়েছিল। তাদের নিকট চিয়াংকাইসেকের প্রকৃত উদ্দেশ্য অপ্রকাশিত ছিল না—অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা বুঝেছিল চিয়াং-এর আকাঙ্ক্ষা কি। চিয়াংও তুঙপেই বাহিনী সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন না—সিয়ানে তুঙপেই সৈন্যদের চাঞ্চল্য, তাদের জাপ-বিরোধী মনোভাব ও কমিউনিস্ট-প্রীতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আর সিয়ান-এ তাঁর নিজস্ব কোন বাহিনী ছিল না। সুতরাং তাঁর সিয়ান-এ দ্বিতীয় বার পদার্পণের কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি সেনানায়ক চিয়াং-সিআও-সিয়েন-এর অধীনে পনেরো শত "নীল কোর্ত্তা" সিয়ান-এ পাঠিয়েছিলেন। সিয়ান-এ "নীল কোর্ত্তা"দের প্রধান কাজ হয়েছিল কমিউনিস্ট-মতাবলম্বী ছাত্র ও সৈনিকদের বন্দী করা। নীলকোর্ত্তার অত্যাচার শেন্‌সিতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এ-অবস্থায় সর্ব্বদিক দিয়ে সুরক্ষিত হয়ে চিয়াংকাইসেক ১৯৩৬-এর ৭ই ডিসেম্বর সিয়ানফুতে আসেন। শহর থেকে দশ মাইল দূরে লিনটুঙে তাঁর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। চিয়াং-এর আগমনের দু'দিন পরে—৯ই ডিসেম্বর কয়েক সহস্র ছাত্র সিয়ান-এর রাজপথে জাপানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ করবার এক আবেদন-পত্র চিয়াংকে প্রদান করবার জন্য তারা লিনটুঙ অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু সিয়ান-এর গভর্ণর শাও সে-জনতা ছত্রভঙ্গ করে দিতে আদেশ দিলেন; পুলিস-বাহিনী প্রথমে ছাত্রদের উপর নানা ভাবে অত্যাচার করে এবং গুলি বর্ষণ করে। চাঙ তখন এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করে শহরে ফিরে যেতে বাধ্য করেন এবং স্বয়ং

ছাত্রদের আবেদন-পত্র নিয়ে চিয়াং-এর নিকট উপস্থিত হন। চিয়াং ছাত্রদের দাবী উপেক্ষা করলেন এবং ক্রোধান্বিত হয়ে চাঙকে ছাত্রদের সমর্থন করার জন্য তিরস্কার করলেন। অন্যদিকে তুঙপেই ও সিপেই (উত্তর-পশ্চিম চীনের সৈন্যদের সিপেই সৈন্য বলা হ'ত। লালফৌজের বিরুদ্ধে তাদেরও নিয়োজিত করা হয়েছিল এবং লালফৌজের সংস্পর্শে এসে তারাও জাপ-বিরোধী হয়ে উঠেছিল) সেনানায়কেরা জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের এক আবেদন নিয়ে চিয়াং এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। চিয়াং তাদের আবেদনও অগ্রাহ্য করে তাদের আদেশ করলেন কমিউনিস্টদের ধ্বংস সাধন করতে।

সুদীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ছটি সশস্ত্র অভিযানেও চিয়াংকাইসেক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে পারেন নি। সিয়ান-এ ধূমায়িত অসন্তোষের মধ্যেও তিনি ১০ই ডিসেম্বর কুয়োমিন্টাঙ-এর সেনানায়কদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর নব অভিযানের এক পরিকল্পনা করলেন। তুঙপেই, সিপেই ও কানসুস্থিত নানকিং গভর্ণমেণ্টের সৈন্যদের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হবার আদেশও প্রস্তুত হ'ল এবং সে-আদেশ ১২ই ডিসেম্বর জারী হবে বলে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে চিয়াং এ-সিদ্ধান্তও করেছিলেন যে, যদি চাঙ তাঁর আদেশ অমান্য করেন তবে তাঁর ও তুঙপেই সৈন্যদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হবে। লোকচক্ষুর অন্তরালে চিয়াং কমিউনিস্টদের ও তাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন সৈনিকদের বন্দী করবার ব্যবস্থাও করেছিলেন। কিন্তু চিয়াং-এর সমস্ত পরিকল্পনাকে চাঙ ব্যর্থ ক'রে দিলেন। চিয়াং-এর নব পরিকল্পনা চাঙকে ভবিষ্যৎ ভয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিল; চিয়াংকে চাঙ তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই চিনেছিলেন। তাই কালবিলম্ব না ক'রে চাঙ ১১ই ডিসেম্বর রাত্রিতে তুঙপেই ও সিপেই সেনানায়কদের এক বিশেষ সভার ব্যবস্থা করলেন। সে-সভায় স্থির হ'ল যে, ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যেই যে-ভাবে হোক চিয়াংকাইসেককে বন্দী করতে হবে। সকলের তখন ধারণা হ'য়েছিল যে, চিয়াংকে বন্দী করার ভিতর দিয়েই আসবে চীনের মুক্তির পথ।

প্রকৃত পক্ষে হ'লও তাই। চিয়াং বন্দী হ'লেন চাঙ-এর হাতে—সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হ'য়ে গেল।

কিন্তু চীনের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হ'ল।

সিয়ানফু

সিয়ানফু' চীনের ইতিহাসে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। দ্বিধাবিভক্ত চীন ঐক্যবদ্ধ হ'ল সিয়ানফু'তে। সাম্যবাদী চীনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানে সিয়ানফু ছিল চিয়াংকাইসেকের প্রধান সামরিক কেন্দ্র। অবস্থাচক্রে সেই সিয়ানফুই সাম্যবাদী চীন ও কুয়োমিন্‌টাঙ চীনের মিলনের কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়াল। কুয়োমিন্‌টাঙ ও কুঙচানটাঙ-এর সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের গোড়াপত্তন হ'ল সিয়ানফু'তে—১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে। "সিয়ান" চীনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল—সে-অধ্যায়ের মূল কথা ঐক্যবদ্ধ চীনের জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ।

১৯৩৬-এর ১১ই ডিসেম্বরের তুঙপেই ও সিপেই সেনানায়কদের সভার প্রস্তাবানুযায়ী ১২ই ডিসেম্বর তুঙপেই ও সিপেই বাহিনী সিয়ান অধিকার করে, আর চাঙের শরীর-রক্ষকদের নায়ক ক্যাপ্টেন স্থন-মিঙ-চিউ লিনটুঙ অবরোধ ক'রে চিয়াংকাইসেককে বন্দী করে সিয়ানে নিয়ে আসেন। চিয়াংকে হত্যা করা চাঙ বা তার সৈন্যদের উদ্দেশ্য ছিল না—জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে চিয়াংকে বাধ্য করাই ছিল তাদের সঙ্কল্প। বন্দী চিয়াং-এর সম্মুখে তাঁরা জাতীয় মুক্তিসঙ্ঘের নিম্নলিখিত আটটি প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন :

(১) নানকিং গভর্ণমেণ্টের পুনর্গঠন ও জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ রবার সুবিধা সমস্ত পার্টিগুলিকে দেওয়া ;

(২) অন্তর্বিপ্লবের অবসান এবং জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ নীতি গ্রহণ ;

(৩) জাতীয় মুক্তি-সঙ্ঘের সাংহাইতে কারারুদ্ধ সাতজন নেতার মুক্তি ;

(৪) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ;

(৫) জনগণকে সভাসমিতি করবার অধিকার দেওয়া ;

(৬) জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষিত করা ;

(৭) সুন-ইয়াৎ-সেনের "উইল"কে কার্য্যকরী করা ;

(৮) অবিলম্বে একটি জাতীয়-মুক্তি সম্মেলনের আহ্বান করা।

জাতীয় মুক্তি-সঙ্ঘের এই প্রোগ্রাম চীনের লালফৌজ, চীনের সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন ক'রল। কয়েকদিন পরে চাঙেরই চেষ্টায় সিয়ানে লালফৌজ, তুঙপেই বাহিনী ও সিপেই বাহিনীর প্রতিনিধিদের এক মিলিত সভায় এই তিনটি বাহিনীর মধ্যে মৈত্রীবন্ধন অধিকতর সুদৃঢ় হয়। সেই সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী ১,৩০,০০০ তুঙপেই সৈন্য, ৪০,০০০ সিপেই সৈন্য এবং লালফৌজের ৯০,০০০ সৈন্য নিয়ে প্রথম সম্মিলিত জাপ-বিরোধী বাহিনী গঠিত হ'ল এবং সম্মিলিত জাপ-বিরোধী সামরিক পরিচালক-সমিতির সভাপতি হলেন চাঙসুয়েহলিয়াঙ। জাতীয় মুক্তি-সঙ্ঘের আটটি প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করতে লালফৌজ, তুঙপেই বাহিনী ও সিপেই বাহিনীর দৃঢ় সঙ্কল্প শেনসী প্রদেশের সর্ব্বত্র এক নব জাগরণের সূচনা করেছিল। নব সামরিক পরিচালক-সমিতির আদেশে তুঙপেই ও সিপেই বাহিনী শেনসী-হোনান সীমান্তাভিমুখে এবং লালফৌজ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। আত্মরক্ষার জন্যই চাঙ এ-ব্যবস্থা করেছিলেন। অন্যদিকে জাতীয় মুক্তিসঙ্ঘের আটটি প্রস্তাব কার্য্যকরী করার ব্যবস্থাও হয়েছিল—লালফৌজের বিরুদ্ধে অভিযানের বিরতি, সিয়ানফুতে বার শত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, প্রেসের স্বাধীনতা দান, জাপ-বিরোধী সমিতিগুলির উপর প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার প্রত্যাহারই তার প্রমাণ। তখন শত শত ছাত্র মুক্তি পেয়ে গ্রামে গ্রামে সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের জন্য প্রচারকার্য্যে বেরিয়ে পড়ল ; গ্রামে গ্রামে গিয়ে তারা কৃষকদের জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য তৈরী করতে আরম্ভ করল।

এ-কাজগুলি চিয়াং-এর সম্মুখে চাঙের আদেশে ঘট্‌ছিল—চিয়াং তখনও চাঙের হাতে বন্দী। চিয়াং-এর গ্রেফ্‌তারের সংবাদ নানকিং গভর্ণমেণ্টের কাছে

যখন এসে পৌঁছল তখন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য কুয়োমিনটাঙ-এর Standing Committee-র এক সভা হয়। সে-সভায় চাঙকে বিদ্রোহী ঘোষণা ক'রে গভর্ণমেণ্টের সামরিক কার্য্যভার থেকে তাঁকে অপসারিত করবার এবং তাঁর বিরুদ্ধে শীঘ্রই সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত করা হল। চিয়াং-এর মৃত্যু নিশ্চিত মনে করে নানকিং সরকারের প্রধান প্রধান পরিচালকদের মধ্যে এক গোলযোগের সৃষ্টি হ'য়েছিল। চীনের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপতি কে হ'বে?—এ-প্রশ্নই ছিল সে-গোলযোগের মূল কারণ, এবং নানকিং সরকারের তদানীন্তন সমর-সচিব হোইঙ-চিনই এ-গোলযোগের স্রষ্টা। ভাগ্যান্বেষী হোইঙ-চিন ছিলেন জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক। ইতালীয়ান ও জার্মান পরামর্শদাতাদের দ্বারা উৎসাহিত হ'য়ে সৈন্যদল নিয়ে সিয়ান অভিমুখে অগ্রসর হবার জন্য তিনি প্রস্তুত হ'তে আরম্ভ করলেন। বিদ্রোহীদের সন্ত্রস্ত করবার উদ্দেশ্যে নানকিং সরকারের বিমান সিয়ানের উপরে বিচরণ করতে আরম্ভ করে, আর হো'র সৈন্যদলও হোনান সীমান্তে অগ্রসর হ'তে থাকে। হো'র উদ্দেশ্য ছিল সিয়ানের জনসাধারণের উপর বোমা-বর্ষণের অছিলায় চিয়াং-এর মৃত্যু ঘটিয়ে চীনের রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্বভার নিজ হস্তে গ্রহণ করা। কিন্তু বুদ্ধিমতী মাদাম চিয়াংকাইসেক হো'র অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটালেন। তিনি ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে, হো'র অভিযান ফিরিয়ে আনতে পারবে শুধু তাঁর স্বামীর মৃতদেহ; অথচ চাঙের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তাঁর স্বামীর মুক্তি সম্ভব। সুতরাং নানকিং ও সাংহাইতে টি-ভি-সুঙ, এইচ্-এইচ্-কুঙ্, মাদাম চিয়াং, মাদাম সুনইয়াৎসেন চিয়াং-এর সমর্থক ও অনুচরদের একত্রিত ক'রে তাদের সাহায্যে নানকিং সরকারের সিয়ান অভিযানের অবসান ঘটালেন।

বন্দিদশায় চিয়াংকাইসেকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটে। দীর্ঘকাল পরে চিয়াং বুঝলেন যে, চীনের প্রকৃত শত্রু নানকিং-এর জাপ-প্রীতি-সম্পন্ন রাজকর্ম্মচারিগণ, কমিউনিস্ট বা জাপ-বিরোধী চাঙ ও তাঁর সৈন্যগণ নয়। বন্দী চিয়াং-এর অবস্থা সিয়ানে বিপন্ন হয়ে উঠেছিল তুঙপেই ও সিপেই সৈন্যদের বিক্ষুব্ধতায়—তারা চিয়াং-এর মৃত্যুদণ্ডই দাবী করেছিল। তুঙপেই সৈন্যরা

কিছুতেই ভুলতে পারছিল না যে, চিয়াং-এর তোষণ-নীতির ফলেই তাদের জন্মভূমি মাঞ্চুরিয়া জাপানের কুক্ষিগত। কিন্তু কমিউনিজ্‌ম্‌ ধ্বংসকামী চিয়াং-এর জীবন রক্ষা হ'ল কমিউনিস্টদেরই চেষ্টায়। জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ করতে চীনের জাতীয় জীবনে চিয়াং-এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। চিয়াং-এর মৃত্যুদণ্ড চীনে এক প্রবল অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি করবে, ফলে চীনকে গ্রাস করতে জাপানের বিশেষ সুবিধা হবে; অথচ যদি চিয়াংকে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনে স্বীকৃত করান যায়, তবে জাপ-আক্রমণ প্রতিহত করা সহজসাধ্য হবে। তৎকালীন অবস্থার বিশ্লেষণ কমিউনিস্টরা এই ভাবে করেছিল। সুতরাং চিয়াং-এর মৃত্যুদণ্ডের দাবী থেকে সৈন্যদের নিবৃত্ত ক'রে চিয়াং-এর প্রাণ রক্ষা করল কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ছ'টা সশস্ত্র অভিযান পরিচালিত ক'রে অত্যাচার-উৎপীড়নে চীনের আকাশ-বাতাস চিয়াং বিষায়িত করেছিলেন। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬-এর চীনের ইতিহাস কমিউনিস্টদের উপর চিয়াং-এর নিষ্ঠুর অত্যাচারে কলঙ্কিত। কিন্তু কমিউনিস্টরা বন্দী চিয়াং-এর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য লালায়িত ছিল না; তাদের তখন লক্ষ্য ছিল অন্তর্বিপ্লবের অবসান ঘটানো, জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন, আর নানকিং-এ গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা। সে-লক্ষ্যে পৌঁছবার একমাত্র পথ চিয়াং-এর সঙ্গে পরিষ্কার ভাবে আলাপ-আলোচনা এবং তাঁর মুক্তি—কমিউনিস্টরা এ-কথা বুঝেছিল। তাই যখন চিয়াংকে বন্দী ক'রে লিনটুঙ থেকে সিয়ানে নিয়ে আসা হল, তখন কমিউনিস্ট প্রতিনিধি চু-এন-লাই এসে চিয়াংকে অভিনন্দন জানালেন। চু-এন-লাইকে দেখে চিয়াং প্রথমে সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে সিয়ান লাল ফৌজ কর্তৃক অধিকৃত এবং তিনি তাদের হাতেই বন্দী। চু-এন-লাই একদিন তাঁরই পরামর্শদাতা ছিলেন এবং পরে যখন তিনি কমিউনিস্ট হ'লেন তখন তাঁর জীবনের জন্য চিয়াং ঘোষণা করেছিলেন আশী হাজার ডলার। পরে চু-এন-লাই-এর ব্যবহারে চিয়াং আশ্বস্ত হ'লেন। প্রথমেই চাঙ ও চু-এন-লাই তাঁকে চীনের প্রধান সেনাপতি ব'লে স্বীকার করেন। তারপর চু-এন-লাই চীনের মুক্তি-প্রচেষ্টায় কমিউনিস্টদের

কর্ম্মপদ্ধতি বিবৃত করেন। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ দশ বৎসর সশস্ত্র অভিযান পরিচালিত ক'রে পরিশেষে চীনের মুক্তি-প্রচেষ্টায় সেই কমিউনিস্টদের কর্ম্মপদ্ধতি দেখে চিয়াং মুগ্ধ হলেন। চীনের জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তখন চিয়াং, চাঙ, চু-এন লাই ও ইয়াঙ-হু চেঙের (ইনি ছিলেন সিপেই সৈন্যদের প্রতিনিধি) ভিতর আলাপ-আলোচনা চলে ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ২৫শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত। এ-আলোচনা জাতীয় মুক্তিসঙ্ঘের আট প্রস্তাবের ভিত্তিতেই চলেছিল। চিয়াং-এর পরামর্শদাতা ছিলেন একজন অষ্ট্রেলিয়ান—ডব্লিউ, এইচ, ডোনাল্ড। নানকিং-এ ইনি ছিলেন চিয়াং-এর অন্তরঙ্গ বিদেশী বন্ধু ও পরামর্শদাতা। ডোনাল্ড পরামর্শদাতারূপে চাঙের অধীনেও কিছুদিন কাজ করেছিলেন। চিয়াংকে বন্দী করে চাঙ ডোনাল্ডকে সংবাদ দেন সিয়ানে আসতে। ডোনাল্ড ১৪ই ডিসেম্বর সিয়ানে এসে উপস্থিত হলেন। চিয়াং-এর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে তিনি ১৫ই ডিসেম্বর নানকিং গভর্ণমেণ্ট ও সমরসচিব হো'র উদ্দেশে চিয়াং-এর স্বহস্তে লিখিত এক আদেশপত্র নিয়ে লয়াঙে ফিরে এলেন। ১৮ই ডিসেম্বর সেনানায়ক চিয়াং-চিঁউওয়েন (ইনিও চিয়াং-এর সঙ্গে বন্দী হয়েছিলেন) সিয়ান অভিমুখে হো'র পরিকল্পিত অভিযান বন্ধ করবার আদেশ নিয়ে নানকিং-এ এসে পৌছালেন। বন্দী চিয়াংকে এ-সকল সুযোগ-সুবিধা চাঙ শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই দিচ্ছিলেন। ২২-এ ডিসেম্বর মাদাম চিয়াং সিয়ানে আসেন স্বামীকে উদ্ধার করতে।

চাঙ, ইয়াঙ ও চু-এন-লাইর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলে চিয়াং নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করতে স্বীকার করলেন ঃ

(১) অন্তর্বিপ্লবের অবসান এবং কমিউনিস্টদের ও কুয়োমিন্‌টাঙ-এর ভিতর সহযোগিতা স্থাপন ;

(২) জাপানের অগ্রগতি প্রতিরোধকল্পে নানকিং গভর্ণমেণ্টের সশস্ত্র অভিযানের নির্দ্দিষ্ট নীতি গ্রহণ ;

(৩) নানকিংএ জাপ-প্রীতিসম্পন্ন কর্ম্মচারীদের অপসারণ এবং বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন সম্বন্ধে নব পন্থা অবলম্বন ;

(৪) নানকিং সৈন্যদের সমমর্য্যাদায় তুঙপেই ও সিপেই বাহিনীর পুনর্গঠন ;

(৫) জনসাধারণকে অধিকতর রাজনৈতিক স্বাধীনতা দান ;

(৬) নানকিং এ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গভর্ণমেণ্টের সংস্কার। চিয়াং অবশ্য কোন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন না; চাঙ, ইয়াঙ ও চু-এন লাই চিয়াং-এর কথার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। ২৭-এ ডিসেম্বর চিয়াং মুক্ত হয়ে নানকিং-এ আসেন, সঙ্গে চাঙ-ও এলেন বিদ্রোহের শাস্তি গ্রহণ করতে। নানকিং-এ যথারীতি বিচারে ৩১-এ ডিসেম্বর তার উপর দশ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হল। কিন্তু পরের দিনই চাঙকে ক্ষমা করা হয়।

নানকিং-এ প্রত্যাবর্ত্তন করে চাঙ, ইয়াঙ ও চু-এন-লাইর নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে চিয়াং সচেষ্ট হলেন। ১৯৩৭-এর ৬ই জানুয়ারী তাঁর আদেশে উত্তর-পশ্চিম চীনে কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের অবসান ঘটল। এ ঘটনার দু'দিন পরে জাপ-প্রীতিসম্পন্ন কর্ম্মচারী ও সেনানায়কদের অপসারিত করা হল।

চিয়াং-এর অনুরোধে ১৫ই ফেব্রুয়ারী কুয়োমিন্‌টাঙ এর তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চিয়াং-এর উদ্দেশ্য ছিল সিয়ানে স্বীকৃত প্রস্তাবসমূহকে কুয়োমিন্‌টাঙ-এর সাধারণ অধিবেশনে উত্থাপিত করে কার্য্যে পরিণত করার সুব্যবস্থা করা। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিও সেই অধিবেশনে চারটি প্রস্তাব পাঠাল—(১) অন্তর্বিপ্লবের অবসান; (২) বক্তৃতা দেবার, প্রেসের এবং সভা-সমিতি করবার স্বাধীনতা ও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি; (৩) জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনার পন্থা অবলম্বন; (৪) সুনইয়াৎসেনের উইলের তিন প্রস্তাব (পূর্ণস্বরাজ, গণতন্ত্র এবং জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি) কার্য্যকরী করা। কমিউনিস্টরা জানাল যে, যদি তাদের চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয় তবে তারা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ ত্বরান্বিত করবার জন্যে নানকিং গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদের সমস্ত প্রচেষ্টার অবসান ঘটাতে এবং নতুন কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণে প্রস্তুত।

সে-নতুন কর্ম্মপদ্ধতির মূল কথা লালফৌজ ও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের নাম পরিবর্ত্তিত করে যথাক্রমে "জাতীয় বিপ্লবী বাহিনী" ও চীন রিপাব্লিকের বিশিষ্ট স্থানের গভর্ণমেণ্ট রাখা, সোভিয়েট শহরসমূহে শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে সকলকে গণ-তান্ত্রিক অধিকার দান এবং জমি বাজেয়াফ্‌ত করার পন্থার অবসান।

কুয়োমিন্‌টাঙ-এর তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে চিয়াং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, জনসাধারণকে বক্তৃতা দেবার স্বাধীনতা দেওয়া হবে, প্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে, এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দমননীতির অবসান ঘটানো হবে এবং অনুতপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে। অবশ্য কুয়োমিন্‌টাঙ-এর অন্যান্য নেতারা যে তাদের কমিউনিজ্‌ম্‌-বিরোধী মনোভাব পরিত্যাগ করতে পারেন নি তা অধিবেশনে কমিউনিস্টদের কর্ম্মাবলীর নিন্দায় ও তাদের সঙ্গে কোন চুক্তি করতে অস্বীকৃতিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চিয়াং-এর চেষ্টায় এই সিদ্ধান্ত হল যে, চারটি শর্ত্তে কমিউনিস্টদের নবজীবন আরম্ভের সুযোগ-সুবিধা দানে কুয়োমিন্‌টাঙ-এর সম্মতি আছে। সে-চারটি শর্ত্ত এইরূপ—(১) লালফৌজের বিলোপ সাধন করে তাকে জাতীয় সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, (২) সোভিয়েট রিপাব্লিকের অবসান ঘটাতে হবে ; (৩) সুনইয়াৎসেনের সান-মিন নীতির তিন প্রস্তাবের বিরোধী কমিউ-নিস্ট প্রোপাগাণ্ডা বন্ধ করতে হবে ; (৪) শ্রেণী-সংগ্রামকে পরিত্যাগ করতে হবে। কুয়োমিন্‌টাঙ-এর এই শর্ত্তগুলির ভাষা যদিও কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহ-যোগিতা স্থাপনের ভাষা নয়, তবু শেষ পর্য্যন্ত কমিউনিস্টদের সঙ্গে বিরোধের অবসান ঘটাতে কুয়োমিন্‌টাঙ-এর নেতৃবৃন্দ স্বীকৃত হল। অন্যদিকে কুয়োমিন্‌-টাঙ-এর কেন্দ্রীয় কমিটি তখন জাপানের খপ্পর থেকে চীনের অপহৃত প্রদেশ-সমূহের পুনরুদ্ধার ও চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯৩৭-এর ২২-এ নভেম্বর জন-সাধারণের এক কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।

মোটের উপর নানকিং গভর্ণমেণ্ট জাতীয় মুক্তি-সঙ্ঘের আট প্রস্তাবই বিভিন্ন ভাবে স্বীকার করে নিল। উত্তর-পশ্চিম চীনে বিদ্রোহ প্রশমিত হ'ল, ফেব্রুয়ারীতে নানকিং সরকারের সৈন্যবাহিনী বিনাবাধায় সিয়ান অধিকার করল। তুঙপেই

বাহিনীকে শেনসী থেকে আনহুই ও হোনানে পাঠান হল এবং সিপেই বাহিনী নানকিং সরকারের অধীনে থাকল। এর পরে মার্চ মাসে কমিউনিস্টদের সঙ্গে নানকিং গভর্ণমেণ্টের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়। কুয়োমিন্‌টাঙ-এর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই কমিউনিস্টরা নানকিং সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে স্বীকৃত হয়েছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার করেই কমিউনিস্টরা তাদের কর্ত্তব্য স্থির করেছিল—নির্ব্বিচার বিপ্লবোচ্ছ্বাস তাদের ভিতর আত্মপ্রকাশ করে নি। যে-দেশের জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা নেই, সে-দেশের জনগণের বৈপ্লবিক কাজ সোশালিজ্‌মের আশু প্রবর্ত্তন নয়; সে-দেশের জনগণের বৈপ্লবিক কাজ জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম—এ-কথা চীনের কমিউনিস্টরা ভালভাবেই বুঝেছিল। তাই যখন জাপানী সাম্রাজ্য-তন্ত্র চীনকে গ্রাস করতে উদ্যত তখন চীনা কমিউনিস্টরা জনগণের সম্মুখে সোশালিজ্‌মের আশু প্রবর্ত্তনের বাণী নিয়ে আসেনি, তারা এল চীনের স্বাধীনতা রক্ষার বাণী নিয়ে।

সিয়ানে চিয়াং-এর প্রতিনিধি সেনানায়ক চাঙচুঙ্‌ ও কমিউনিস্টদের প্রতিনিধি চু-এন-লাইর ভিতর কথাবার্ত্তার ফলে এপ্রিল, মে ও জুন মাসে (১৯৩৭) চীনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। সোভিয়েট শহরগুলির সঙ্গে বহির্জগতের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ফলে সোভিয়েট শহরগুলির অবস্থার উন্নতি দেখা যায়; ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, নতুন নতুন কমিউনিস্ট সাহিত্যের আমদানি, ইয়েনানে একটি লাইব্রেরী স্থাপন, কমিউনিস্ট পার্টির স্কুলের ছাত্র-সংখ্যার বৃদ্ধি, Red Academy-তে দু' হাজার ছাত্রের যোগদান:—জনগণের জীবনে এক নব চেতনার সাড়া এনে দিয়েছিল। নানকিং সরকারের দফ্‌তরে কাগজপত্রে কমিউনিস্ট পার্টি তখনও বে-আইনী, কিন্তু কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দমননীতি প্রয়োগের অবসান হওয়ায় কমিউনিজ্‌মের বাণী দেশময় প্রচার করবার সুবিধা কমিউনিস্টরা পেয়েছিল। কুয়োমিন্‌টাঙ-এর নীতির এই পরিবর্ত্তনের ফলে মে মাসে সোভিয়েট রিপাব্লিকের নাম "বিশিষ্ট স্থানের গভর্ণমেণ্ট" রাখা হয় এবং লালফৌজ জাতীয় সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হবার জন্যে আবেদন করে। মে ও জুন মাসে কমিউনিস্ট পার্টির এক

সম্মেলন হয়—সে-সম্মেলনে কুয়োমিন্‌টাঙ-এর সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। সুনইয়াৎসেনের সান-মিন নীতির তিন প্রস্তাবকে কমিউনিস্টরা আবার ১৯২৫-২৭-এর ন্যায় সম্মান ক'রতে আরম্ভ কর'ল, কুয়োমিন্‌টাঙ-এর বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য ও জমি বাজেয়াফ্‌তের পন্থা পরিত্যাগ কর'ল। যে-সমস্ত জমি বাজেয়াফ্‌ত করা হ'য়েছিল তা' নিয়ে আর কথা উঠল না, কিন্তু ভবিষ্যতে আর জমি বাজেয়াফ্‌ত করা হবে না, এ-প্রতিশ্রুতি তারা চিয়াংকে দিল। জমি বাজেয়াফ্‌তের পন্থা ত্যাগ করার ফলে সোভিয়েট শহরগুলির আর্থিক অবস্থা খারাপ হ'য়ে ওঠে। সে-জন্য চিয়াং সোভিয়েট শহরগুলিকে নানকিং থেকে অর্থসাহায্য করেছিলেন। জুন মাসে চিয়াং সিয়ান থেকে চু-এন-লাইকে কুলিঙে আনিয়ে নানকিং সরকারের মন্ত্রিসভার সভ্যদের সঙ্গে চীনের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করে দিলেন। এ-আলোচনায় স্থির হ'ল যে, নভেম্বরে চীনের জনসাধারণের যে-কংগ্রেস হবে তা'তে কমিউনিস্টরাও প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। এ-সকল কার্য্যে চিয়াং ও কমিউনিস্টদের আন্তরিকতা প্রমাণিত হ'ল।

এই নব কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণে কিন্তু কমিউনিস্টরা তাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। নতুন পারিপার্শ্বিকের পর্য্যালোচনায় মার্ক্‌সের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়োগ করেই তারা কর্ম্মপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত ক'রেছিল; কিন্তু তাদের লক্ষ্য তারা অবিচলিত রেখেছে। চীনের প্রোলেটারিয়ান বিপ্লব, (শ্রমিক-বিপ্লব) জয়যুক্ত করাই তাদের লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে পৌঁছুতে হ'লে চীনের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করা প্রয়োজন; স্বাধীন গণতান্ত্রিক চীনই সোশালিস্ট চীনের পথ উন্মুক্ত ক'রে দেবে। তাই জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্র যখন চীনকে গ্রাস করতে উদ্যত, তখন কমিউনিস্টরা সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন করতে অগ্রসর হ'য়ে ভুল করেনি।

১৯৩৭-এ চীনে যখন জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠিত হ'ল, তখন জাপান ভবিষ্যৎ ভেবে চীনকে আক্রমণ করবার সুযোগ অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করে। সম্মিলিত ফ্রণ্টের বিস্তৃতির ফলে চীনে জাপানের আধিপত্য যে সমূলে বিনষ্ট হ'বে সে-সম্বন্ধে জাপানের কোন সন্দেহই থাকল না। সুতরাং

সম্মিলিত ফ্রন্টের প্রারম্ভেই চীনকে আঘাত করা প্রয়োজন মনে ক'রে ১৯৩৭-এর ৭ই জুলাই জাপান আরম্ভ করল তার চীন অভিযান। সে-অভিযানকে বাধা দিল ঐক্যবদ্ধ চীন।

চীন-জাপান যুদ্ধ

পৃথিবীর সাম্প্রতিক ইতিহাসে যুদ্ধের দুটি বিভিন্ন রূপ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে—ন্যায় যুদ্ধ আর অন্যায় যুদ্ধ। বিদেশীর আক্রমণ থেকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যতন্ত্রের দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্তি-প্রচেষ্টায় উপনিবেশ ও অধীন দেশসমূহের যুদ্ধই ন্যায় যুদ্ধ। আর পররাজ্য গ্রাস ও অনুন্নত দেশগুলিকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত যুদ্ধই অন্যায় যুদ্ধ। চীনে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের রথচক্র যে-যুদ্ধের অবতারণা করেছে সে-যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে অন্যায় যুদ্ধ। সে-যুদ্ধের আরম্ভ ১৯৩৭-এর ৭ই জুলাই। যুদ্ধারম্ভ থেকেই জাপানী সাম্রাজ্যবাদী ও সমরবাদীরা তারস্বরে প্রচার ক'রে আসছে যে, চীনে জাপানের যে-যুদ্ধ তা ন্যায় যুদ্ধ। জাপ-কবি নোগুচি থেকে আরম্ভ ক'রে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রশস্তি রচনায় নিযুক্ত প্রচারক পর্য্যন্ত সকলেই জগৎবাসীর সম্মুখে প্রচার করেছে যে, "জাপানের চীন-অভিযানের একটা বিশেষ সংস্কৃতিমূলক উদ্দেশ্য আছে; জাপান চায় চীনবাসী ও সমগ্র এসিয়াবাসীকে বলশেভিকদের খপ্পর থেকে মুক্ত করতে, পৃথিবীর শান্তি রক্ষা করতে; জাপানের কাম্য বিশ্বশান্তি, কিন্তু যুদ্ধ জয় ব্যতীত শান্তি স্থাপন অসম্ভব; আর জাপবাসীদের দিক থেকে যুদ্ধই শান্তির পথ, ধ্বংসের পথ নহে।" কিন্তু জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের এই অভিনব প্রচার-প্রচেষ্টা বিশ্বের শান্তি ও মুক্তিকামী জনগণকে ভুলাতে পারে নি। জাপানের চীন অভিযানের প্রারম্ভেই তাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়েছে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের স্বরূপ; জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের লক্ষ্য আজ জগৎবাসীর সম্মুখে প্রকাশিত। শুধু চীনবাসীকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে শাসন ও

শোষণই জাপানের লক্ষ্য নয়—তার লক্ষ্য সুদূরপ্রসারী : সমগ্র এসিয়াবাসীর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

বিংশ শতাব্দীর জাপান উনবিংশ শতাব্দীর উপনিবেশ ও অধীন দেশসমূহের শোষণকারী ইয়োরোপেরই ফলস্বরূপ। জাপানী সাম্রাজ্যবাদী ও সমরবাদীরা বৃটিশ জাতির ইতিহাসের যোগ্য ছাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাপানীদের সাধনা হয়েছিল ইয়োরোপীয়দের রণচাতুর্য্য ও কর্ম্মকুশলতা আয়ত্ত ক'রে স্বদেশের শক্তি প্রতিষ্ঠা। সে শক্তি-প্রতিষ্ঠাই দুর্ব্বল প্রতিবেশী চীনের অমঙ্গলের উৎস। তার প্রমাণ ১৮৯৪-৯৫-এ চীনকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে চীন-অঞ্চলে জাপানের ক্ষমতা বিস্তার, ১৯০৪-০৫-এ রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ১৯১০-এ আশ্রিত কোরিয়াকে জাপ-সাম্রাজ্যভুক্ত করা, প্রথম মহাযুদ্ধারম্ভে জার্মানীর হাত থেকে চীনের শাংটুং প্রদেশ দখল এবং যুদ্ধান্তে শাংটুং প্রদেশ চীনকে ফেরৎ দিতে অস্বীকার, ১৯১৫ সালে চীনের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ইউনান-শি-কাই-র নিকট থেকে জাপানের একুশটি দাবী আদায়, (অবশ্য ১৯১৭-এ আমেরিকার বিরোধিতায় অনেক দাবী তাকে প্রত্যাহার করতে হয়), ১৯৩১-এ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ এবং ১৯৩২-এ মাঞ্চুকুয়ো নামে নতুন ছায়াশ্রিত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, ১৯৩৩-এ জেহোল প্রদেশ দখল, ১৯৩৫-৩৬-এ দক্ষিণ মঙ্গোলিয়ায় প্রভাব বিস্তার এবং চীনে চাহার-হোপেই অঞ্চলে নিজেদের ছায়াশ্রিত স্বতন্ত্র রাজ্য শাসনের বন্দোবস্ত এবং পরিশেষে ১৯৩৭-এ জাপানের চীন-অভিযান।

চীন-বিজয়ের পরিকল্পনা জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রসারের মূল কথা—১৯২৭-এর টানাকা পত্রের ভিতর এর বীজ নিহিত। ব্যারণ টানাকা জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রসারের এক অভিনব পরিকল্পনা করেছিলেন। এ-পরিকল্পনা গোপন রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছিল ; কিন্তু সাম্রাজ্য বিস্তারের উন্মাদনায় উন্মত্ত জাপ-সমরবাদীদের জন্য সে-চেষ্টা ফলবতী হয়নি। এই পরিকল্পনাই টানাকা-পত্র নামে অভিহিত। টানাকা-পত্রকে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের *Mein Kamff* বলা যেতে পারে। টানাকা-পত্রের মর্ম্মকথা এইরূপ : "চীনকে জয় করবার

জন্য আমাদের মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া জয় করতে হবে। যদি আমরা চীনকে জয় করতে সক্ষম হই, তবে এসিয়ার অন্যান্য দেশগুলি ও দক্ষিণ সাগরের দেশসমূহ আমাদের ভয়ে ভীত হ'য়ে উঠবে এবং আমাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে। তখন সমগ্র পৃথিবী বুঝবে যে পূর্ব এসিয়া আমাদেরই।··· চীনের সমস্ত ধনসম্পদ করায়ত্ত ক'রে আমরা ভারতবর্ষ, মালয়, দক্ষিণ সাগরের দ্বীপমালা, এসিয়া মাইনর এবং, এমন কি, ইয়োরোপ-বিজয়ের পথে অগ্রসর হব। কিন্তু মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই হবে আমাদের অগ্রগতির প্রথম সোপান।"

১৯২৭-এ উহান-এ যখন চীনের গণশক্তির ঐক্য ভেঙ্গে গেল এবং চিয়াং-কাইসেক তার কমিউনিস্ট-দমন অভিযান আরম্ভ করলেন তখন থেকেই জাপান চীন আক্রমণের পরিকল্পনা করল। চীনে অন্তর্যুদ্ধের সুবিধা গ্রহণ করে জাপান ধীরে ধীরে গ্রাস করল মাঞ্চুরিয়া এবং ১৯৩৩-এ টাঙকুট্রুস্ শান্তি-প্রস্তাব অনুযায়ী উত্তর চীনে বিস্তার করল তার আধিপত্য। এর পর ১৯৩৪-এর এপ্রিল মাসে জাপান পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকে জানিয়ে দিল তার আমাউ-ঘোষণাবাণী। আমাউ-ঘোষণা-বাণীর অর্থ হচ্ছে যে, এসিয়ায় রাজত্ব করবে শুধু জাপান, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের স্থান এখানে নেই এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র মনরো-নীতি প্রয়োগে যেমন নিজের প্রাধান্য বজায় রেখেছে ভবিষ্যতে চীন-অঞ্চলে জাপান অনুরূপ কর্তৃত্বের দাবী করবে। ১৯৩৫-এ জাপান নানকিং গবর্ণমেণ্টের চীনের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট-দমনে ব্যাপৃত থাকার সুবিধা গ্রহণ ক'রে হো-উমেৎসু চুক্তি স্বাক্ষরিত করে। চীনের তদানীন্তন সমর-সচিব হো-ইঙ-চিন ও উত্তর চীনে অবস্থিত জাপ-বাহিনীর সেনানায়ক উমেৎসু-র ভিতর ১৯৩৫-এর জুন মাসে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি জাপানের নিকট চিয়াংকাইসেকের নতি স্বীকারের শেষ নিদর্শন। উত্তর চীনের হোপেই ও চাহার প্রদেশ থেকে নানকিং গবর্ণ-মেণ্টের সৈন্যবাহিনীর অপসরণ, ঐ দুই প্রদেশে, এমন কি, পিপিং ও তিয়েনসিন শহরেও কুয়োমিনটাঙ-এর আধিপত্যের অবসান, জাপ-বিরোধী আন্দোলনের দমন এবং জাপ-মন্ত্রণাদাতাদের অনুজ্ঞাতেই ঐ দুই প্রদেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা—এই চুক্তির মর্ম্মকথা। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর থেকে জাপানী

সমরবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীরা হোপেই, চাহার, শানসি, শাংটুং, সুইউয়ান—উত্তর চীনের এই পাঁচটি প্রদেশকে চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের হস্তচ্যুত করবার পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আলোচনা করতে আরম্ভ করে। ধনসম্পদে এই পাঁচটি প্রদেশ প্রকৃতই সমৃদ্ধশালী। শানসি প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে কয়লা মজুত আছে—Encyclopaedia Britannica-র মতে সে-কয়লা সমগ্র পৃথিবীর হাজার বছরের চাহিদা মেটাতে পারে। হোপেই প্রদেশ কয়লা, গম ও তুলায়—চাহার ও সুইউয়ান প্রদেশ লৌহ, চামড়া ও পশমে সমৃদ্ধশালী। তাই জাপানী সাম্রাজ্যবাদী ও সমরবাদীরা দেখল যে মাঞ্চুকুয়োর সঙ্গে উত্তর চীনের এই পাঁচটি প্রদেশে যদি আর্থিক কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করা যায়, তবে জাপানের এসিয়া বিজয়ের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করবার কাঁচা মালের অভাব হবে না। ১৯৩৬-এ জাপানী সমরবাদীরা তদানীন্তন পররাষ্ট্র-সচিব হিরোতা-র মারফৎ নিজেদের তিনটি উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করে—(১) চীন-জাপানের এক জোটে পূর্ব্ব-এসিয়ায় কমিউনিজমের অগ্রগতি রোধ; (২) জাপানের অনুজ্ঞা ব্যতীত চীনের বিদেশের সঙ্গে সমস্ত রাষ্ট্রিক যোগ বর্জ্জন; এবং (৩) চীন ও জাপানের উপর একই আর্থিক কর্ত্তৃত্ব স্থাপন। এর অর্থ অবশ্য প্রকারান্তরে চীনের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে জাপানের বশ্যতা স্বীকার। চীনের রাষ্ট্রিক কর্ণধার চিয়াংকাইসেক প্রথমে অনেকটা জাপানী প্রভাব মেনে চলেছিলেন, কিন্তু কমিউনিস্টদের প্রচারকার্য্যের ফলে দেশের জনমত এর ঘোর বিরোধী ছিল; হো-উমেৎসু চুক্তির বিরোধিতায় চীনের ছাত্র-ছাত্রীরা এক অভূতপূর্ব্ব জনবিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। তাই পরিশেষে জনমতকে মেনে চল্‌তে চিয়াংকাইসেক বাধ্য হলেন। জাপ-বিরোধী মনোভাব তখন দেশময় প্রবল হ'য়ে ওঠে; সিয়ানে চিয়াংকাইসেক কমিউনিস্টদের সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন করে চীনে জাপানের অগ্রগতি প্রতিহত ক'রতে স্বীকৃত হন। চীনে অন্তর্যুদ্ধের অবসান হল, গণশক্তির ঐক্য আবার চীনে মাথা তুলে দাঁড়াল। চীনে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রসারের বিরুদ্ধে এই সম্মিলিত ফ্রণ্ট জাপানকে শঙ্কিত করে তোলে। জাপান দেখল যে, এই সম্মিলিত ফ্রণ্টের যদি বিস্তৃতি

ঘটে তবে চীনে জাপানের কোন আধিপত্যই থাকবে না। আর সম্মিলিত ফ্রন্টের আরম্ভেই চীনকে আক্রমণ না করলে চীনে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের ভবিষ্যৎ তমসাবৃত। এই সম্মিলিত ফ্রন্টের আরম্ভেই জাপান চীন আক্রমণের সুযোগ খুঁজতে লাগল। ১৯৩৭-এর সাতই জুলাই জাপানী সমরবাদীরা এই সুযোগ পেল লিউকুচাওতে। লিউকুচাও উত্তর চীনে পিপিংয়ের নিকটবর্ত্তী একটি রেলওয়ে জংসন। সাতই জুলাই রাত্রিতে জাপ-সৈন্য এসে লিউকুচাওতে অধিষ্ঠিত চীনা বাহিনীর সেনানায়কের নিকট দাবী করে যে তাদের নিরুদ্দিষ্ট একজন সৈন্যকে খুঁজবার জন্য জাপ-বাহিনীকে লিউকুচাওতে প্রবেশ করতে দেওয়া হোক। চীনা সৈন্যরা এ-দাবী মেনে নিতে স্বীকৃত না হওয়ায় জাপ-সৈন্যরা সেই রাত্রিতেই চীনা বাহিনীকে আক্রমণ করে এবং সেই থেকেই আরম্ভ হয় জাপানের চীন-অভিযান। সে-অভিযানকে বাধা দিল ঐক্যবদ্ধ চীন। তাই জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনবাসীর যে-যুদ্ধ, সে-যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে ন্যায় যুদ্ধ—দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পেই চীনবাসীদের যুদ্ধ।

কিন্তু যুদ্ধারম্ভে সামরিক দিক থেকে চীন যুদ্ধের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সিয়ানফু-তে সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠিত হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চিয়াংকাইসেকের অধিনায়কত্বে নানকিং গভর্ণমেণ্ট তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিল চীনা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এবং সে-জন্য জাপানী সমরবাদীদের সন্তুষ্ট রাখতে চিয়াংকাইসেক উন্মুখ ছিলেন। চীনকে সমরোপযোগী করবার লক্ষ্য তখন নানকিং গবভর্ণমেণ্টের ছিল না। সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠিত হবার পর যদিও কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিনটাঙ জাপানের অগ্রগতি প্রতিহত করবার জন্য চীনকে সমরোপযোগী করতে সচেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু সময় তারা বেশী পায় নি। সম্মিলিত ফ্রণ্টের প্রথম স্তরেই জাপানের চীন-অভিযান আরম্ভ হয়। তাই যুদ্ধারম্ভে চীন এক অভিনব যুদ্ধনীতি গ্রহণ করল। তার সাধনা হ'ল এ-যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করা এবং সে-অবসরে যুদ্ধজয়ের জন্য চীনের জনগণকে প্রস্তুত ক'রে তোলা। চীনের বিস্তৃত জনপদ ও বিশাল জনসংখ্যাই চীনের প্রধান দুর্গ, আর

দেশপ্রেমই চীনবাসীর যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র। চীনের সেনানায়কেরা, বিশেষ করে, কমিউনিস্টরা তখন উপলব্ধি করেছিল যে জাপানীদের আক্রমণের প্রথম পর্ব্বে চীনের প্রধান প্রধান নগরীগুলির পতন অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু যদি জনসংখ্যার দিকে লক্ষ্য রেখে সৈন্য সমাবেশ এবং জনপদের দিকে লক্ষ্য রেখে দেশের আর্থিক উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করা যায় তবে পরিণামে যুদ্ধে জয়লাভ সুনিশ্চিত। দীর্ঘ-স্থায়ী সমগ্র জন-প্রতিরোধের সম্মুখে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হয়ে যাবে সে-সম্বন্ধে চীনের কর্ণধার চিয়াংকাইসেক ও কমিউ-নিস্টদের কোন সন্দেহ ছিল না। এই যুদ্ধনীতির বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে ১৯৩৮-এর নভেম্বরে কমিউনিস্ট নেতা মাওৎসেতুঙ জাপানের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছিলেন—(১) প্রথম স্তরে যুদ্ধে লিপ্ত একটি পার্টি আক্রমণ করছে, আর অপর পার্টি পিছু হটছে; (২) দ্বিতীয় স্তরে উভয় পার্টির সৈন্য বাহিনীই এক সামরিক অচল অবস্থার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং উভয় পার্টিই চূড়ান্ত সংগ্রামকে এড়িয়ে যাচ্ছে; (৩) তৃতীয় স্তরে প্রথম স্তরের আক্রমণকারী পার্টি এখন পিছু হট্‌ছে, আর যে-পার্টি প্রথম স্তরে পিছু হটেছিল সেই পার্টি এখন প্রতি-আক্রমণ শুরু করেছে। অর্থাৎ (১) প্রথম স্তরে জাপ-বাহিনী আক্রমণ করে চীনা বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে চীনের পূর্ব্ব সীমান্তের প্রধান প্রধান শহরগুলি অধিকার করেছে; (২) দ্বিতীয় স্তরে জাপ-বাহিনীর আক্রমণ-শক্তি শীর্ষস্তরে গিয়ে পৌছেছে—পশ্চিম চীনের পূর্ব্ব পাদদেশে এসে জাপ-বাহিনী আর অগ্রসর হতে পারছে না; জাপানের সমরশক্তি তখন ক্ষয়োন্মুখ, আর চীনের সর্ব্বশক্তি তখন সৈন্য সমাবেশ এবং সামরিক ও আর্থিক সংগঠনে নিযুক্ত—সমরক্ষেত্রে তখন এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে; (৩) তৃতীয় স্তরে আভ্যন্তরিক ও আন্তর্জ্জাতিক দ্বন্দ্বের ফলে জাপান ধ্বংসের মুখে এসে পৌছেছে, আর চীনও তখন তার সমস্ত আর্থিক ও সামরিক শক্তি প্রয়োগে বিরাট সৈন্য সমাবেশ করে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করেছে—ফলে চীনের জয় সূচিত হচ্ছে।

যুদ্ধারম্ভ থেকে ১৯৩৮-এর অক্টোবরে ক্যাণ্টন ও হ্যাঙ্কাউ নগরীর পতন পর্য্যন্ত হচ্ছে চীনের যুদ্ধের প্রথম স্তর। এ-অধ্যায়ে জাপ-বাহিনী চীনের প্রধান প্রধান

শহরগুলি, রেলপথ, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি অধিকার করে এবং চীনা সৈন্যবাহিনী পশ্চাদগমন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এ-স্তরটিকে আবার চীনের রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠনের স্তর বলা যেতে পারে। এই সময়েই (১) চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিনটাঙ-এর সহযোগিতায় যে জাতীয় সম্মিলিত ফ্রণ্ট যুদ্ধের প্রারম্ভে গঠিত হয়েছিল তার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়; (২) যুদ্ধে লিপ্ত সমস্ত চীনা বাহিনীগুলিকে এক সামরিক কর্ত্তৃত্বাধীনে একত্রিত করা হয় এবং তাদের আধুনিক রণসজ্জায় সজ্জিত করে তোলা হয়; (৩) বিশ্বাসঘাতক ও জাপানের নিকট আত্মসমর্পণ-প্রয়াসী কুয়োমিন্টাঙ নেতা ওয়াংচিং-ওয়াই ও কমিউনিস্ট নেতা চান-গো-তাওকে যথাক্রমে কুয়োমিন্টাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিতাড়িত করা হয়; (৪) দেশের সর্ব্বত্র এক অভূতপূর্ব্ব গণ-জাগরণ লক্ষিত হয়; জাপ-সৈন্যদের অতর্কিতে আক্রমণ করবার জন্য জনগণের ভিতর এক নব প্রেরণার সঞ্চার হয় এবং তার ফলেই গণসেনার (Partisan Group) উদ্ভব। জাপ-সৈন্যদের অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়েই গণসেনারা নিজেদের সুসজ্জিত করে তোলে। সুতরাং যুদ্ধের প্রথম স্তরে একদিকে চীনের বড় বড় শহরগুলি, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি জাপানের করতলগত হয় এবং আর্থিক ক্ষেত্রে চীনের যথেষ্ট ক্ষতি হয়; অন্যদিকে কিন্তু যুদ্ধারম্ভকালীন অবস্থার তুলনায় যুদ্ধের দ্বিতীয় স্তরের প্রারম্ভে চীন রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

হ্যাঙ্কাউ-র পতন ও চুঙকিঙ-এ রাজধানী স্থানান্তরিত করার পর থেকেই চীন-যুদ্ধের দ্বিতীয় স্তরের আরম্ভ। যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখ ভাগে সামরিক অচল অবস্থার সৃষ্টিই এ-স্তরের প্রধান কথা। ক্যান্টন ও হ্যাঙ্কাউ অধিকারের পর জাপবাহিনী এক অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হয়—অগ্রসর হবার আর কোন ক্ষেত্রই তারা পেল না। তখন চীন গভর্ণমেণ্টের ও সেনানায়কদের রণ-কৌশল হয়েছিল যুদ্ধের সম্মুখ ভাগে জাপ-বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা এবং জাপ-বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগে গণসেনার দলগুলিকে এমনভাবে সুসংগঠিত

করা যাতে জাপ বাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা যায়। তখন চীনের জনগণের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—(১) জাপ-অধিকৃত প্রদেশসমূহে জাপানীদের ছায়াশ্রিত স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপন অসম্ভব করে তোলা; (২) চীনের প্রাকৃতিক ধন-সম্পদ যাতে জাপানীরা আত্মসাৎ না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা, (৩) এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য ও সমরসম্ভার প্রেরণের জন্য জাপানীদের যান-বাহনাদির সমস্ত পথগুলিকে বিনষ্ট করে দেওয়া। যুদ্ধের এ-পর্ব্বের বিশেষত্ব চীনা সৈন্যদের গেরিলাযুদ্ধ। চীনা সৈন্যরা অতর্কিতে জাপানীদের আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। চীনে গেরিলা রণ-কৌশলের স্রষ্টা কমিউনিস্টরা—এই গেরিলা রণকৌশলেই কমিউনিস্টরা চিয়াংকাইসেকের কমিউনিস্ট-দমনের ছয়টি অভিযান ব্যর্থ করে দিয়েছিল। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভেও কমিউনিস্ট বাহিনী এই গেরিলা-রণকৌশল প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে। কমিউনিস্ট বাহিনী যে-অঞ্চলেই যুদ্ধে নিযুক্ত হয়েছে সে-অঞ্চলেই তারা যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেছে, তাদের জাপ-বিরোধী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে চীনের জন-প্রতিরোধের শক্তি বাড়িয়ে তুলেছে, আর নিজেদের সৈন্যদের সামরিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে তাদের জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তিকে সুদৃঢ় করেছে। কিন্তু যুদ্ধারম্ভে কুয়োমিন্‌টাঙ বাহিনীর অবস্থা ছিল বিভিন্ন—প্রুশিয়ার সেনানায়কদের হাতেই তাদের শিক্ষাদীক্ষা; গেরিলা-রণকৌশল সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, জনগণের সঙ্গে তারা ছিল যোগসূত্রহীন। আর তাদের কোনরূপ রাজনৈতিক শিক্ষাও ছিল না। যুদ্ধের প্রথম স্তরে কমিউনিস্টদের রণ-কৌশলে মুগ্ধ হয়ে ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে চিয়াংকাইসেক কুয়োমিনটাঙ সেনানায়কদের কমিউনিস্ট সেনানায়কদের পদানুসরণ করতে আদেশ করেছিলেন। যুদ্ধের দ্বিতীয় স্তরে তিনি কমিউনিস্টদের রণ-কৌশল গ্রহণ ক'রে কুয়োমিন্‌টাঙ-এর সেনানায়কদের সম্মুখে যুদ্ধের এক নব নীতি উপস্থিত করলেন। তাঁর ভাষায় সে-নীতি হচ্ছে —(১) সৈন্যদের চেয়ে জনসাধারণ অধিকতর প্রয়োজনীয়; (২) স্থানু যুদ্ধের চেয়ে গেরিলা যুদ্ধ অধিকতর প্রয়োজনীয়, (৩) আমাদের সৈন্যদের

রাজনৈতিক শিক্ষা তাদের সামরিক শিক্ষার চেয়ে অধিকতর প্রয়োজনীয়; (৪) বুলেটের চেয়ে প্রচারকার্য্য অধিকতর প্রয়োজনীয়। কুয়োমিন্‌টাঙ বাহিনীকে গেরিলা রণ-কৌশলে শিক্ষিত করবার জন্য তিনি একটি স্কুলও স্থাপন করেন এবং অষ্টম বাহিনীর ইয়েচিয়েনইঙকে এই স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

প্রথম স্তরের যুদ্ধের ফলে জাপান চীনের বড় বড় শহরগুলি অধিকার করেছে সত্য, কিন্তু চীনের অনেক গ্রাম্য অঞ্চলে জাপ-বাহিনী প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। এই সকল গ্রাম্য অঞ্চলে এমন সব লোক আছে, যারা আজ পর্য্যন্ত একটি জাপ-সৈন্যও দেখেনি। এই সব জনগণকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ক'রে তোলাই ছিল চিয়াংকাইসেকের উদ্দেশ্য। এজন্যই গেরিলা রণ-কৌশল দিয়ে অধিকৃত প্রদেশসমূহে জাপানীদের আক্রমণ ক'রে জাপানের ছায়াশ্রিত রাষ্ট্র গঠনে বাধা সৃষ্টি ক'রে জাপ-সৈন্যদের অগ্রগতি চিয়াংকাইসেক প্রতিহত করছিলেন এবং ইত্যবসরে প্রতি-আক্রমণের জন্য তিনি চীনের জনগণকে তৈরী ক'রে তুলছিলেন—এ-বিষয়ে কমিউনিস্টরা ছিল চিয়াংকাইসেকের পূর্ণ সমর্থক এবং তারাই এ-কার্য্যে সাফল্যের সহিত অগ্রসর হয়েছিল। প্রতিরোধ-সংগ্রামকে পরিচালিত কর; দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে নিজেদের অবিচলিত রাখ; এবং জাপবিরোধী জাতীয় সম্মিলিত ফ্রণ্টকে শক্তিশালী ও বিস্তৃত কর—এই তিনটি কাজকে প্রত্যেকটি কমিউনিস্টের প্রধান কর্ত্তব্য ব'লে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দ্দেশ দিয়েছিল। এ-পথে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত ক'রে এবং প্রতি-আক্রমণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত ক'রে লক্ষ্যে পৌছবার জন্য কমিউনিস্টরা ছিল দৃঢ়সঙ্কল্প। অবশ্য সে-লক্ষ্য চীনে সোশালিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠা নয়; সে-লক্ষ্য হচ্ছে চীনের মাটি থেকে জাপ-আক্রমণকারীদের বিতাড়িত ক'রে চূড়ান্ত জয়লাভ এবং স্বাধীন মুক্ত নব্য চীনের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠন।

প্রথম স্তরের যুদ্ধের ফলে দ্বিতীয় স্তরে চীনকে দু'ভাগে বিভক্ত দেখা যায়—স্বাধীন চীন আর অধিকৃত চীন। উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম চীনকে কেন্দ্র ক'রেই স্বাধীন চীনের প্রতিষ্ঠা। চুঙকিঙ এই স্বাধীন চীনের রাষ্ট্রকেন্দ্র। জাপ-

অধিকৃত চীনে জাপানীরা তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে আজও সক্ষম হয় নি। অধিকৃত চীনই জাপ-বিরোধী সংগ্রামের মূল ভিত্তি। চীনের সে-অঞ্চল সামরিক বলে অধিকার ক'রে জাপানীরা পিপিং ও নানকিং-এ ছায়াশ্রিত গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের উদ্যোগ করে এবং জনগণকে ভুলাবার জন্য সিন-মিন-ডান নামে এক রাজনৈতিক পার্টি গঠন করে। আর্থিক ক্ষেত্রে জাপানীরা অধিকৃত অঞ্চলের ধনসম্পদ হস্তগত করতে আরম্ভ করে এবং জাপ-বিরোধী সংগ্রামের বাস্তব ভিত্তিকে বিনষ্ট করবার উদ্দেশ্যে সে-অঞ্চলের জনগণের আর্থিক ব্যবস্থার ধ্বংস সাধনে জাপ-সমরবাদীরা সচেষ্ট হয়। কিন্তু জাপানীদের এই রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে অধিকৃত অঞ্চলে গেরিলা-যুদ্ধের প্রয়োগ-ই যে শ্রেষ্ঠপন্থা তা তখন কমিউনিস্ট নেতা মাওৎসেতুঙ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে-ছিলেন। কিন্তু গেরিলা যুদ্ধের সাফল্য ও চীনের চূড়ান্ত জয়লাভ সম্বন্ধে অনেকের মনেই তখন সংশয় ছিল। এ সংশয় দুটি প্রশ্নের আকারে দেখা দিয়েছিল। প্রথমত, শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ কি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা যেতে পারে? এবং অধিকৃত জেলাসমূহ কি জাপবিরোধী সংগ্রামের কেন্দ্র হিসাবে বিকাশ লাভ করে শক্তিশালী হ'তে পারে? দ্বিতীয়ত, যখন চীনের বড় বড় শহরগুলি ও রেলপথ শত্রুর করতলগত, তখন গ্রাম্য অঞ্চলের সহায়তায় কি জাপ-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা ক'রে জয়লাভ করা যেতে পারে? এর উত্তরে মাওৎসেতুঙ তখন বলেছিলেন—"হাঁ, পারা যায়।" তাঁর উত্তরের স্বপক্ষে তিনি ১৯৩৮-এর নভেম্বরে তিনটি জিনিসের উল্লেখ করেছিলেন।

"প্রথমত, চীনদেশ একটি অর্দ্ধ উপনিবেশের পর্য্যায়ভুক্ত। যদিও বড় বড় শহর-গুলি চীনের জীবনের প্রধান কেন্দ্র, কিন্তু গ্রামসমূহ ও শহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ জনপদের উপর শহর তার আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। কারণ, চীন দেশের বিশালতা ও তার অসংখ্য গ্রামের তুলনায় শহর ক্ষুদ্র। তা ছাড়া দেশের জনশক্তি ও আর্থিক শক্তি চীনের বিস্তৃত অঞ্চলেই নিবদ্ধ, শহরে নয়।

"দ্বিতীয়ত, চীনের বিশালতা। চীনের এক অংশ জাপানের করতলগত হওয়াতে চীনের বিশালতা খর্ব্ব হয় নি। অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে জাপান চীন

আক্রমণ করে। চীনে জন-প্রতিরোধের ফলে জাপ-বাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত এবং অনেকাংশে দুর্ব্বল ও ছত্রভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু সম্মিলিত প্রতিরোধের এই একমাত্র ভিত্তি নয়। স্বাধীন চীনের প্রধান কেন্দ্রগুলি য়ুনান, কুয়েইচো, জেচ্য়ান প্রভৃতি প্রদেশসমূহ শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অধিকন্তু উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ চীনে পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধের ফলে অধিকৃত অঞ্চলে শত্রুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

"তৃতীয়ত, আজকের চীন। যদি পঞ্চাশ, কি চল্লিশ, কি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও একটি শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চীন দেশ আক্রমণ করত, যেমন একদিন বৃটেন আক্রমণ করেছিল ভারতবর্ষ, তবে চীনের সম্পূর্ণ পদানত হওয়া থেকে নিস্তার ছিল না। কিন্তু আজকের অবস্থা বিভিন্ন। রাজনীতিক পার্টির বিকাশের, সৈন্যবাহিনী সংগঠনের এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার পথে চীন অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। প্রগতিশীল চীন হচ্ছে সেই মূল শক্তি যা শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। জাপানের আজ ক্ষয়োন্মুখ অবস্থা। সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আর্থিক ও সামরিক বিকাশের পথ আজ শেষ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। জাপানী ধনতন্ত্র তার বিকাশের পথেই তার ধ্বংসকারী সৃষ্টি করেছে।"

চীনের জনগণের পক্ষে যুদ্ধের এই দ্বিতীয় স্তর আবার প্রতি-আক্রমণের প্রস্তুতির স্তর। কিন্তু প্রতি-আক্রমণের জন্য চীনের জনগণকে তৈরী করে তোলা তখন সহজ ছিল না। দীর্ঘ দিন যুদ্ধের ফলে চীনা সৈন্যদের রণসম্ভার প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের সুবিধাও চীনের তেমন ছিল না। যুদ্ধের প্রথম বছরে বহির্জগৎ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর ব্যাপারে চীনের বেশ সুযোগ-সুবিধা ছিল এবং আমদানী করা হয়েছিলও প্রচুর। কিন্তু সমুদ্রতটের বন্দরগুলি জাপানের হস্তগত হওয়ায় বহির্জগৎ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনা চীনের পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ঐ বাধা অতিক্রম করবার জন্য চীনবাসীরা সচেষ্ট হয়। হ্যাঙ্কাউর পতনের পর পশ্চিম চীনে চুঙকিঙ-এ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করে চীনবাসীরা বহির্জগৎ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনবার তিনটি পথ বের করে নিল। একটি হচ্ছে চুঙকিঙ থেকে উত্তর-পশ্চিম চীনের কান্সু ও সিন-

কিয়াং প্রদেশের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার তুর্ক-সিব রেলওয়ে পর্য্যন্ত —এ-পথ দিয়ে চীন সরকার সোভিয়েট রাশিয়া থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করবার সুব্যবস্থা করে। (রুশ-জার্মান যুদ্ধারম্ভ পর্য্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়া চীনকে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে)। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, চুংকিং থেকে কুনমিঙ এবং কুনমিঙ থেকে আরও দক্ষিণে ইন্দোচীনে ফরাসী-অধিকৃত হেইফঙ বন্দর পর্য্যন্ত। (১৯৪০-এ ফ্রান্স হিটলারের নিকট নতি স্বীকার করার পর জাপান ভিসি গভর্ণমেণ্টকে এ পথটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য করেছে।) তৃতীয়টি হচ্ছে, চুঙকিঙ থেকে কুনমিঙ এবং কুনমিঙ থেকে পশ্চিমে ব্রহ্ম-সীমান্তের ভিতর দিয়ে লাসিও পর্য্যন্ত। লাসিও আবার ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন বন্দরের সঙ্গে মান্দালয়ের ভিতর দিয়ে রেললাইনে সংযুক্ত। (১৯৪০-এর প্রথম দিকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও জাপানের দাবীতে এ-পথটি বন্ধ করে দেয়, কিন্তু ১৯৪০-এর শেষের দিকে জাপানের সমস্ত দাবী উপেক্ষা করে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এ-পথটি আবার উন্মুক্ত করে দিল। ১৯৪২-এ ব্রহ্মদেশ জাপানের করতলগত হওয়ায় এ পথটি বন্ধ হয়ে গেছে।) এই তিনটি পথ যতদিন উন্মুক্ত ছিল ততদিন চীনা গভর্ণমেণ্ট বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। যুদ্ধের এ-অধ্যায়ে আর্থিক ক্ষেত্রেও চীন উন্নত হয়ে ওঠে। প্রধান প্রধান শিল্প-কেন্দ্র ও বন্দরগুলি জাপানের হস্তগত হওয়াতেও চীনের আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েনি। সাধারণ দৃষ্টিতে এটা বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু এ-বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নেই যে, চীনের বর্ত্তমান শক্তির স্তম্ভ হচ্ছে পশ্চিম চীনের প্রাকৃতিক ধনসম্পদ। সে-ধনসম্পদই আজ চীনের আর্থিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। হ্যাঙ্কাউর পতনের পর চুঙকিঙ-এ গভর্ণমেণ্ট সরিয়ে আনার পর পশ্চিম চীনের প্রাকৃতিক ধন-সম্পদের উৎকর্ষের দিকে চিয়াংকাইসেক মনোনিবেশ করেন। পশ্চিম চীনকে সোনার চীন বলা হয়ে থাকে। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এর উৎকর্ষের কোন ব্যবস্থাই চীন সরকার করেনি, তার সমস্ত শক্তি তখন নিয়োজিত ছিল পূর্ব্ব ও মধ্য চীনে। কারণ, পূর্ব্ব ও মধ্য চীন নদী ও সমুদ্রের দ্বারা বহির্জগতের সঙ্গে সংযুক্ত। চুঙকিঙ-এ রাষ্ট্রকেন্দ্র স্থাপিত হবার পর বাধ্য হয়েই

গবর্ণমেণ্টকে পশ্চিম চীনের উৎকর্ষের ব্যবস্থা করতে হয়, বিশেষ করে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্য। কিন্তু এ-পথে বাধা ছিল প্রচুর। প্রথমত চীনের শিল্পকেন্দ্রগুলি জাপানের হস্তগত হবার পূর্ব্বে সেখানকার কলকারখানার সমস্ত আসবাব সরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট করতে পারে নি ; এর জন্য দায়ী আমলাতন্ত্রের অক্ষমতা, যুদ্ধকালে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অনিচ্ছা, চীনা ধনিকদের স্বার্থপ্রণোদিত অদ্ভুত মনোবৃত্তি। দ্বিতীয়ত খুব অল্পসংখ্যক ধনিকেরা স্বেচ্ছায় পশ্চিম চীনে তাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠান সরিয়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ধনকুবেররা এবং শিল্পপতিরা তাদের ধনসম্পদ নিয়ে হংকং প্রভৃতি বিদেশাধিকৃত বন্দরসমূহে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল ; তাদের ধারণা ছিল, যুদ্ধ অল্পদিন স্থায়ী হবে, এবং সে-জন্য জাপানের সঙ্গে একটা মীমাংসার জন্য চীনা গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিতেও তারা কসুর করে নি। সুতরাং পশ্চিম চীনের আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে গভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। তবে এ-অসুবিধা বহুল পরিমাণে লাঘব হয়েছিল রিওয়াই এলে-এর নেতৃত্বে শিল্প-কো-অপারেটিভ আন্দোলনের বিস্তৃতিতে। রিওয়াই এলে-এর জন্মভূমি নিউজিল্যাণ্ডে। কিন্তু তিনি দুর্গতদের দুঃখ মোচনে ও উন্নতি বিধানে জীবন উৎসর্গ করেছেন। জাপানের আক্রমণের ফলে যখন চীনের শিল্পকেন্দ্রগুলি শত্রুর করতলগত হল, তখন রিওয়াই এলে তাঁর অন্যান্য সহকর্ম্মীদের সাহায্যে চীনের অনধিকৃত অঞ্চলে শিল্প কো-অপারেটিভ গঠনের জন্য উদ্যোগী হন। তাঁর পরিকল্পনা ১৯৩৮-এ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরই হ্যাঙ্কাউর পতনের পূর্ব্বে এ-পরিকল্পনা চিয়াংকাইসেক গ্রহণ করেন এবং কো-অপারেটিভ গঠনের ভার রিওয়াই এলে-এর উপর ন্যস্ত করেন। এ-ছাড়া চুঙকিঙ-এ গভর্ণমেণ্ট নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে কতকগুলি কলকারখানার প্রবর্ত্তন করে, আর যে-সকল ধনিকেরা তাদের কলকারখানা পশ্চিম চীনে সরিয়ে নিয়ে এসেছিল তাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেও গভর্ণমেণ্ট দ্বিধা করে নি। ফলে পশ্চিম চীনে শিল্পোন্নতি বেশ অগ্রসর হয়। ১৯৩৮-এর অক্টোবর থেকে ১৯৪১-এর অক্টোবর পর্য্যন্ত পশ্চিম চীনে শিল্পোন্নতি কতদূর হয়েছে তা কয়েকটি দৃষ্টান্তে

পরিস্ফুট হবে। চায়ের ব্যবসা সেখানে এত উন্নত হয়েছে যে, "দি চাইনিজ ন্যাশনাল টি করপোরেশন' সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে পণ্য বিনিময়ের এক চুক্তি পর্য্যন্ত করেছে। এ-চুক্তির কথা হল যে, চীন সোভিয়েট রাশিয়াকে ১,৫০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের চা সরবরাহ করবে এবং এর বিনিময়ে সোভিয়েট রাশিয়া অনুরূপ মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র চীনকে দেবে। এখানকার পশমের ব্যবসা প্রসিদ্ধ; এ-ব্যবসাও বেশ প্রসার লাভ করেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে পশ্চিম চীন থেকে পশম তিয়েনসিনে পাঠানো হতো বিক্রীর জন্য। কিন্তু বর্ত্তমানে এ-পশম রাশিয়ার নিকট বিক্রি করা হচ্ছে। এখানকার কয়লার খনিতে ১২,০০০ মিলিয়ন টন কয়লা মজুত আছে। লোহা-ও এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাই কয়লা ও লোহার জন্য চীনা গবর্ণমেণ্ট বিদেশের উপর নির্ভর না করেও চলতে পারে। ম্যাঙ্গানীজ, টাংস্টেন ও কাঠের তেলের জন্যও পশ্চিম চীন প্রসিদ্ধ। পশ্চিম চীনের কাঠের তেলের চাহিদা আমেরিকায় খুব বেশী এবং এ-ব্যবসা চীনের একচেটিয়া। মোট কথা, এমন কোন প্রয়োজনীয় খনিজ বা কৃষিজাত পণ্য নেই যা পশ্চিম চীনে পাওয়া যায় না বা উৎপন্ন করা যায় না। মোটের উপর আজ পশ্চিম চীনে এক নতুন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।

চীনের যুদ্ধের দ্বিতীয় স্তরে আর একটি বিষয় চোখে পড়ে। সেটা হচ্ছে উত্তর চীনের অবস্থা। যদিও উত্তর চীনের বড় বড় শহরগুলিকে জাপান অধিকার করেছে এবং সেখানে ওয়াং-চিং-ওয়াই-এর নেতৃত্বে ছায়াশ্রিত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রও স্থাপন করেছে, তবুও উত্তর চীনকে পদানত করতে জাপান পারে নি। অধিকৃত বড় বড় শহর ও রেলওয়ে কেন্দ্রগুলি জাপ-সৈন্যদের ঘাঁটি, কিন্তু রেললাইনের কয়েক মাইল দূরেই চীনাদের প্রকৃত বাসস্থান—সেখানে জাপ সৈন্যদের কোন আধিপত্য নেই; আর্থিক ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন, চীনা সরকারের নোটই তাদের ভিতর প্রচলিত। সেখানকার অধিবাসীদের নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা অটুট আছে; চীনা সরকারের আদেশেই সেগুলি পরিচালিত। এই সকল গ্রামে জাপানীরা মাঝে মাঝে গিয়ে কৃষকদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছে, কিন্তু তবুও সেখানে কোন আধিপত্য বিস্তার করতে জাপ-সৈন্যরা সক্ষম

হয় নি। বরং এই সব গ্রামগুলিতেই চীনের জনগণের জাপ-প্রতিরোধশক্তি নিহিত। এই সব গ্রামগুলিকে কেন্দ্র ক'রে চীনের 'গণবাহিনীর আন্দোলন' (Partisan Movement) গড়ে উঠেছে। কমিউনিস্ট সেনাধ্যক্ষ চুতের অধিনায়কত্বে অষ্টম রুট-বাহিনীর সৈন্যরা এখান থেকেই গেরিলা যুদ্ধ দিয়ে জাপানীদের অতর্কিত আক্রমণ করে উত্তর চীনে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রসারের পথে প্রবল বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। একদিকে এমনিতর অসহযোগ, অন্যদিকে গেরিলা রণকৌশল—এ দুয়ের সঙ্গে লড়তে গিয়ে জাপানকে তার সৈন্যের একটি বিশিষ্ট অংশকে উত্তর চীনে রাখতে হচ্ছে। ফলে চুংকিং গবর্ণমেণ্টের অনেক সুবিধা হয়েছে।

ধীরে ধীরে যুদ্ধের দ্বিতীয় স্তরে চীনের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ১৯৪০-এর নভেম্বর মধ্য চীনে হাম নদীর উপত্যকায় চীনা সৈন্যদের নিকট জাপ-সৈন্যদের পরাজয়ে এবং ১৯৪১-এর প্রথমার্দ্ধে চীনা সৈন্যদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে জাপ-বাহিনীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীনের কোয়াংশী প্রদেশ পরিত্যাগে। এ-ছাড়াও ১৯৪১-এ উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ চীনের আরো অনেক স্থলে জাপ-বাহিনী চীনা সৈন্যদের নিকট পরাজিত হয়ে পিছু হট্‌তে বাধ্য হয়। এ-সব ঘটনাবলী চীনের জনগণ যে প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে—তারই আভাস জানায়। অন্যদিকে আন্তর্জ্জাতিক ও আভ্যন্তরিক দিক দিয়ে ১৯৪১-এ জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্র এক চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হতে থাকে। ১৯৪১-এর ২১শে জানুয়ারী জাপ-পার্লামেণ্টের নিম্ন পরিষদে বাজেট কমিটিতে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ে চীন-জাপান যুদ্ধ সম্পর্কে করুণ সুরে ঘোষণা করেন—"চীন-জাপান সঙ্ঘর্ষ পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করল বটে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত মীমাংসার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। সমরবিভাগ এ-জন্য দায়ী নয়—আমি ছাড়া আর কেউই দায়ী নয়। অজস্র অর্থ ও সহস্র সহস্র সৈন্য নষ্ট হয়েছে ব'লে আমি সম্রাটের নিকট এবং জাতির নিকট নিজেকে ক্ষমার অযোগ্য ব'লে মনে করি। এ-বিষয়ে একটা সুরাহা করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব ব'লে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি এবং এই হবে রাষ্ট্রের

প্রতি আমার শেষ কর্ত্তব্য"। প্রিন্স কোনেয়ে-র এই ঘোষণা থেকেই জাপানের আভ্যন্তরিক অবস্থা বোঝা যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপানের পূর্ব্ব এসিয়ায় "নববিধান" প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্পে শঙ্কিত হ'য়ে ১৯৪১-এ আমেরিকা ঘোষণা করে যে, চীনকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আমেরিকা সাহায্য করবে, এবং প্রকৃতপক্ষে সে-ঘোষণা কার্য্যকরী করতেও আমেরিকা উদ্যোগী হয়। আর ঐ বৎসরই প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের অগ্রগতি প্রতিহত করবার জন্য আমেরিকা, বৃটেন, চীন ও ডাচ-ইষ্ট-ইণ্ডিজ নিয়ে একটি যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হয়। এই গভীরতম সঙ্কটের হাত থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ও সমরবাদীরা শেষ চেষ্টা করতে যত্নবান হয় প্রিন্স কোনোয়ে-মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে এবং সেনানায়ক তোজোকে প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ক'রে। সেই শেষ চেষ্টার অভিব্যক্তি আমরা দেখি, জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় (১৯৪১ ৭ই ডিসেম্বর)।

জাপানের আমেরিকা ও বৃটেনের বিরুদ্ধে অভিযানের আরম্ভ থেকেই চীনের যুদ্ধের তৃতীয় স্তরের প্রতি-আক্রমণের স্তরের সূচনা। চীনের যুদ্ধ আজ আর শুধু চীনবাসীদের যুদ্ধ নয়, ফাশিস্টবিরোধী বিশ্বমুক্তিযুদ্ধেরই একটি অংশ। জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযানের ফলে চীনবাসীদের প্রতি-আক্রমণ করার প্রচুর সুযোগ-সুবিধা হ'ল। সোভিয়েট রাশিয়ার 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকা তাই লিখেছিলঃ 'প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে চীন সকল রণক্ষেত্রেই প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করিবে।' চীনা বাহিনী মালয়, ব্রহ্মদেশে জাপবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে এগিয়ে এল। দেশের অভ্যন্তরে ও বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে জাপবাহিনীর উপর চীনা সৈন্যদল প্রতি-আক্রমণ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই প্রতি-আক্রমণ বেশী জোরালো হ'তে পারলো না মালয় ও ব্রহ্মরণক্ষেত্রে যুদ্ধের বিপর্য্যয়ের ফলে। মালয়, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ জাপানের করতলগত হ'ল। ব্রহ্মরোড দিয়ে কোন অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করার সুবিধা চীনের আর রইল

না। তাই চীনা বাহিনী প্রতি-আক্রমণের স্তরের প্রথম অধ্যায়েই প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হ'ল। কিন্তু এতে চীনবাসীরা একটুও দমেনি—নিজেদের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করেই তারা প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এর প্রমাণ পাই আমরা উত্তর চীনে অধিকৃত অঞ্চলে কমিউনিস্ট বাহিনীর ঘাঁটি প্রতিষ্ঠায়। উত্তর চীনে জাপ-অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যেই কমিউনিস্ট বাহিনী ইতিমধ্যে ১২টি ঘাঁটি তৈরী করেছে। এর এক-একটি ঘাঁটি আমাদের এক-একটি জেলার ন্যায়। ৪৫ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রথমে কমিউনিস্টরা প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করে, কিন্তু আজ ১২টি ঘাঁটি স্থাপন করার পর সেই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা হচ্ছে ৫ লক্ষের উপর। দক্ষিণ চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীন এবং মধ্য চীনেও অনেক ক্ষেত্রে চীনা বাহিনীর আঘাতে জাপানীরা পিছু হ'টে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আজও চীনবাসীরা জাপ সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ সুতীব্র করে তুল্তে পারেনি। এর প্রধান কারণ প্রতি-আক্রমণের অগ্রদূত কমিউনিস্টদের উপর চিয়াংকাইসেক-গবর্ণমেণ্টের অদ্ভুত আচরণ। জাপানের হাতে যখন চীনের স্বাধীনতা বিপন্ন, তখনও কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ চিয়াংকাইসেক-গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। ফলে চীনের জাতীয় ঐক্য আজ বিপন্ন। কমিউনিস্টদের ঐকান্তিক চেষ্টায় যে জাতীয় ঐক্য চীনে গড়ে উঠেছিল, আজ সে জাতীয় ঐক্যের পথে প্রধান অন্তরায় চিয়াংকাইসেক ও কুয়োমিন্টাঙ।

চীনের যুদ্ধ ও চীনের কমিউনিষ্টগণ

(১)

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নরমেধযজ্ঞের রথচক্র আজ চীনের বুকে রচনা করেছে পৈশাচিক বর্ব্বরতার এক নির্ম্মম কাহিনী ; এসিরিয় সম্রাটদের নিষ্ঠুরতা এর কাছে হার মানে। এর উপমা মেলে শুধু ইয়োরোপের অধিকৃত অঞ্চলে, বিশেষ ক'রে সোভিয়েট রাশিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে, নাৎসী জার্মানীর অমানুষিক নিষ্ঠুরতায়। জাপানের অত্যাচার, উৎপীড়নে চীনের আকাশ-বাতাস বিষায়িত, মৃত্যুর করাল ছায়া চীনে পরিব্যাপ্ত। নরহত্যায়, লুণ্ঠনে ও রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচারে বিজয়-উল্লাসী জাপ-সৈন্য রচনা করেছে ইতিহাসের এক কলঙ্ক-ময় অধ্যায়। কিন্তু তাতেও চীনের জনগণ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হয়নি। জীবন পণ ক'রে আজও তারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। জাপানীদের বর্ব্বরোচিত নিষ্ঠুর অত্যাচারে চীনের জনগণ একটুও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। যদিও চীনের অধিকৃত অঞ্চলে জাপান বিশ্বাসঘাতক ওয়াং-চিং-ওয়াই-এর নেতৃত্বে এক ছায়াশ্রিত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু সে-গবর্ণমেণ্টের ভিত্তি যে কত দুর্ব্বল তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় চীনবাসীদের জাতীয় শপথ-আন্দোলনের বিস্তৃতি দেখে। চীনবাসীদের জাতীয় শপথ-আন্দোলন আরম্ভ হয় দক্ষিণ চীনের কোয়াংশি প্রদেশে। তারপর সে-আন্দোলন বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ে জাপ-অধিকৃত অঞ্চলে। আবালবৃদ্ধ-বনিতা সবাই শপথ গ্রহণ করেছে যে—"কখনই বিশ্বাসঘাতক হব না ; কখনই শত্রুর আনুগত্য স্বীকার করব না ; কখনই শত্রুর জন্য গুপ্তচরের কাজ করব না ; কখনই শত্রুর ছায়াশ্রিত গবর্ণমেণ্টে অংশ গ্রহণ করব না ; কখনই শত্রুর জন্যে রাস্তা তৈরী করব না ; কখনই শত্রুর পথপ্রদর্শক হব না ; কখনই শত্রুর দেশের পণ্যসামগ্রী কিনব না ; কখনই শত্রুর প্রচলিত ব্যাঙ্ক নোট গ্রহণ করব না ; কখনই আর্থিক ক্ষেত্রে শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করব না।" চীনের এই জন-প্রতিরোধে চীনের কমিউনিস্টদের দান অশেষ। নরহত্যায়, লুণ্ঠনে, রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচারে জাপ-সৈন্য একদিকে রচনা

করছে এক কলঙ্কময় ইতিহাস ; অন্যদিকে চীনা সৈন্য, বিশেষ করে কমিউনিস্ট বাহিনী—অষ্টম রুট-বাহিনী ও নূতন চতুর্থ বাহিনী—শৌর্য্যে-বীর্য্যে, সংগ্রামের নতুন কায়দায় দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আত্মত্যাগে সৃষ্টি করেছে ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। চীনা কমিউনিস্টদের রণকৌশল ও সহিষ্ণুতায় এবং কর্ম্মপদ্ধতিতে জগৎবাসী আজ স্তম্ভিত। কমিউনিস্টরাই আজ নব্য চীনের অগ্রদূত—তারাই বিপ্লবী চীনের স্রষ্টা। তারাই জাপানের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধকে পরিণত করেছে জনযুদ্ধে, জনগণের হাতে তারাই প্রথম তুলে দিয়েছে রাইফেল। প্রকৃত গণতন্ত্র তারাই প্রথম প্রবর্ত্তন করেছে প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্ট শাসিত অঞ্চলে। শত বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়েও তারাই প্রতিষ্ঠা করেছে চীনের জাতীয় ঐক্য। এ-কথা আজ নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, যদি চীনে কোন কমিউনিস্ট, কোন অষ্টম রুট-বাহিনী এবং কোন প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্ট না থাকত, তবে চীনে অরাজকতন্ত্রই বিরাজ করত।

সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন, প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা আর অষ্টম রুট আর্মি ও নব চতুর্থ আর্মির অপূর্ব্ব রণ-কৌশল—চীনের যুদ্ধে কমিউনিস্টদের কীর্ত্তিস্তম্ভ। নির্ব্বিচার বিপ্লবোচ্ছ্বাস দ্বারা কমিউনিস্টদের কর্ম্মপন্থা নির্ণীত হয় না ; সর্ব্ব দেশেই তাদের কর্ম্মপন্থা নির্ণীত হয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার দ্বারা, এবং সে-বিচারে কমিউনিস্টরা একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করে থাকে। সে-দৃষ্টিভঙ্গীর মূল কথা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। সর্ব্বদেশেই কমিউনিস্টদের চূড়ান্ত লক্ষ্য সোশালিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠা করা এবং কমিউনিস্টরাই প্রকৃতপক্ষে খাঁটি আন্তর্জাতিকতাবাদী। কমিউনিস্টদের প্রধান স্লোগান হল—"দুনিয়ার মজুর এক হও।" কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম। তাই প্রত্যেক দেশেই কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণের সময় দেশ, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার করাই কমিউনিস্টদের প্রধান কর্ত্তব্য। চীনা কমিউনিস্টরা এ-কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছে। তাই জাপানের চীন-অভিযানের সূচনাতেই (১৯৩১) কমিউনিস্টরা অগ্রসর হয়েছে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে। তারা তখন চীনে সোশালিজ্‌মের আশু প্রবর্ত্তনের বাণী নিয়ে আসেনি। তারা

এসেছে চীনের জাতীয় দল কুয়োমিনটাঙ-এর সঙ্গে জাপ-বিরোধী সম্মিলিত জাতীয় ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব নিয়ে। চীনের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, চীনে বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন জাতীয় মুক্তি, পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র। চীনের বিপ্লব বর্ত্তমানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে। আর চীনে সোশালিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রবর্ত্তী হওয়ার একমাত্র উপায় পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক রিপাব্লিকের প্রতিষ্ঠা; এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্টরা সোশালিজ্‌ম্ ও কমিউনিজ্‌মের স্তরে পৌঁছবে। চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে কমিউনিস্টদের প্রধান লক্ষ্য সান-মিন নীতির তিন প্রস্তাবকে (জাতীয় মুক্তি, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং জনসাধারণের জীবিকা সংস্থান) কার্য্যকরী করা। তাই সান-মিন নীতির উপর ভিত্তি করে কুয়োমিনটাঙ-এর সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনে তারা দ্বিধা করে নি। এই সম্মিলিত ফ্রন্টের আর একটি কথা হলো, জাপ-আক্রমণ প্রতিহত করা।

চীনা কমিউনিস্টদের এই সম্মিলিত ফ্রন্টের কর্ম্মপদ্ধতি দেখে অনেকের মনে ধারণা হতে পারে যে, চীনা কমিউনিস্টরা আন্তর্জাতিকতা ও সোশালিজ্‌মের আদর্শকে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু সে-ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কমিউনিস্টরা যে আন্তর্জাতিকতাবাদী, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা কি একই সময়ে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী হতে পারে? ঐতিহাসিক অবস্থানুসারে কমিউনিস্টরা দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী হতে পারে এবং সেরূপ হওয়া তাদের কর্ত্তব্যও। নাৎসী নেতা হিটলার ও ফাশিস্ট জাপানীদের জাতীয়তাবাদ আছে। আবার ভারতের ও চীনের কমিউনিস্টদেরও জাতীয়তাবাদ রয়েছে; কমিউনিস্টরা হিটলার ও ফাশিষ্ট জাপানীদের জাতীয়তাবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই জার্মানীর ও জাপানের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা ফাশিস্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত—তারা তাদের সাধ্যমত জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও হিটলারের পরাজয়ের জন্য সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করছে।

তাদের এ-কর্ম্মপন্থা যে নির্ভুল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জাপ ও জার্মান আক্রমণকারীরা যে শুধু আক্রান্ত দেশসমূহের অধিবাসীদের জীবন দুর্ব্বিষহ করে তুলছে তা নয়, তারা জাপান ও জার্মানীর জনগণকেও নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর অতল গহ্বরে। ভারতের ও চীনের কমিউনিস্টদের পক্ষে আজ জাতীয়তাবাদ আন্তর্জ্জাতিকতারই পূরক বা সহায়। "ফাশিস্ট আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে পিতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা কর"—বর্ত্তমানে এই স্লোগান-ই চীনা কমিউনিস্টদের প্রধান কথা, এবং তাই তারা দেশপ্রেমিক হিসাবেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। চীনের স্বাধীন অস্তিত্বই যদি বিলুপ্ত হয়, তবে কমিউনিস্টরা সোশালিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠিত করবে কোথায়? চীনা কমিউনিস্টরা ঘোষণা করেছে—"প্রোলেটারিয়াট ও নিপীড়িত জনগণের মুক্তির পূর্ব্বে সমগ্র জাতির মুক্তি-ই একান্ত প্রয়োজন; জাতীয় বৈপ্লবিক যুদ্ধের সময় আমাদের জাতীয়তা আন্তর্জ্জাতিকতার-ই যথার্থ বহিঃপ্রকাশ।" তাই চীনের কমিউনিস্টরা আজ জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে বিপ্লবী চীনের পুরোধায় দণ্ডায়মান। কমিউনিস্টদের প্রত্যেকটি রাইফেল আজ জাপ-সৈন্যদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত—তাদের লক্ষ্য যুদ্ধজয়। চীনা কমিউনিস্টরা আজ দেহের শেষ রক্তবিন্দুটি দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করছে।

কিন্তু দেশরক্ষায় ব্রতী হ'য়ে কমিউনিস্টরা সোশালিজ্‌মের আদর্শকে পরিত্যাগ করেনি। চীনের জাতীয় দল কুয়োমিন্‌টাঙ-এর সঙ্গে তারা জাপবিরোধী সম্মিলিত জাতীয় ফ্রণ্ট গঠন করেছে সত্য; কিন্তু তাদের পার্টির (চীনের কমিউনিস্ট পার্টি) স্বাধীন অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান। তারা সোশালিজ্‌মের আদর্শে-ই বিশ্বাসী। কখনই এবং কোন অবস্থায়ই তারা তাদের আদর্শ এবং মার্ক্‌স্ লেনিনের মতবাদকে পরিত্যাগ করবে না। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রোগ্রাম দুই ভাগে বিভক্ত: (১) ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন এবং সোশালিজ্‌মের প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজে শ্রেণী-বিভাগের বিলোপ সাধনের মধ্য দিয়ে জনগণের মুক্তির জন্য উর্দ্ধতম প্রোগ্রাম; (২) জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য আশু ন্যূনতম প্রোগ্রাম। এই ন্যূনতম প্রোগ্রামকে কার্য্যকরী করবার জন্যই চীনা

কমিউনিস্টরা আজ দৃঢ়সঙ্কল্প। এই ন্যূনতম প্রোগ্রামের মূল কথা হল সান-মিন নীতির তিন প্রস্তাব। তাই চীনা কমিউনিস্টরা ঘোষণা করেছে—“সোশালিজ্‌ম্‌ প্রতিষ্ঠাকল্পে চীনের প্রোলেটারিয়াটদের সর্ব্বপ্রথম চীনবাসীদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।”

কিন্তু চীনবাসীদের মুক্তির জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের নিষ্ঠুর আক্রমণের প্রতিরোধ এবং সে-কার্য্যে অগ্রণী হয়েছে কমিউনিস্টরা। তাদের সামন্ততন্ত্রবিরোধী কার্য্য ও জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকার্য্যের ভিতর শেষোক্ত কার্য্যকেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছে। যদিও চিয়াংকাইসেকের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষাকল্পে তারা জমিদারের জমি কৃষকদের ভিতর বণ্টন বন্ধ করেছে, কিন্তু সে-জন্য তাদের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী কার্য্যের অবসান ঘটে নি। চীনের বিপ্লবের বর্ত্তমান স্তরে তাদের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী প্রোগ্রামের মূল কথা হচ্ছে, দেশব্যাপী গণতন্ত্রের প্রসার এবং জনগণের জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থার উন্নতি। কমিউনিস্টদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফলে চীনের এই যুদ্ধকালীন অবস্থাতেই শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রছাত্রী, যুবকযুবতী, বুদ্ধিজীবী, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রনেতা, সৈনিক, লেখক, লেখিকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, সংস্কৃতি-নায়ক প্রভৃতির ভিতর এক অভিনব গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। কিন্তু এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে প্রধান অন্তরায় চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আদিম যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কমিউনিস্টদের সম্মুখে আজ প্রধান সমস্যা হচ্ছে, কি ভাবে জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের কোন ব্যাঘাত না ক'রে ঐ রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করা সম্ভব। কারণ যদি ঐ রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত না করা যায়, যদি চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে যুদ্ধ জয় অসম্ভব। এ-সমস্যা সমাধানে কমিউনিস্টরাই যে পথপ্রদর্শক তার প্রমাণ প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্ট শাসিত অঞ্চলসমূহ।

১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে সিয়ান-ঘটনার অবসানের পর যখন কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিনটাঙ-এর জাপ-বিরোধী সম্মিলিত জাতীয় ফ্রণ্ট গঠিত হয়, তখন উত্তর-

পশ্চিম চীনের সোভিয়েট রিপাব্লিকের নাম পরিবর্ত্তন করে "সেনসি-কানস্থ-নিঙসিয়া" প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্ট রাখা হয় এবং সম্মিলিত ফ্রণ্টের ভিত্তিতে এ-গভর্ণমেণ্ট পুনর্গঠিত হয়। এ-গভর্ণমেণ্ট চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন, প্রকৃত গণতন্ত্র এখানে বিরাজিত। শ্রেণী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক জনসাধারণেরই ভোটাধিকার আছে। ইয়েনান এই গভর্ণমেণ্টের রাষ্ট্রকেন্দ্র এবং অষ্টম রুট-বাহিনী ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল। ইয়েনান আজ চীনের জনগণের জীবনে নতুন উষার আলো এনে দিয়েছে। জাপ-প্রতিরোধের শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় ইয়েনান আজ চীনের যুবকদের কাছে প্রাণতীর্থ। ইয়েনানের রাজনৈতিক ও সামরিক বিদ্যায়তনে প্রবেশ লাভের জন্য চীনের সমস্ত প্রদেশের যুবক ও যুবতী আজ ইয়েনান অভিমুখে যাত্রী। অবশ্য ইয়েনান অভিমুখে চীনের রাজপথ বিপদমুক্ত নয়; কুয়োমিন্-টাঙ-এর নেতৃবৃন্দের অদ্ভুত মনোভাবের জন্য এ-পথ আজ বিপদসঙ্কুল। কমিউনিস্টদের প্রভাব বিস্তার আজও কুয়োমিন্টাঙ-এর নেতৃবৃন্দ ভালো চোখে দেখতে পারে নি। কিন্তু শত বাধা-বিঘ্নও চীনা যুবাদের তাদের ইয়েনানে শিক্ষালাভের সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। জনগণের ভিতর রাজনৈতিক ও সামরিক শিক্ষা বিস্তারে, গণতন্ত্রের প্রসারে সেনসি-কানস্থ-নিঙসিয়া প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্ট চীনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ইয়েনানের জাপ-বিরোধী সামরিক ও রাজনৈতিক বিদ্যায়তন ও মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় আজ চীনের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। জাপ-বিরোধী সামরিক ও রাজনৈতিক বিদ্যায়তন থেকে প্রতি বৎসর দশ সহস্র যুবক-যুবতী শিক্ষালাভ করে জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করছে। মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীরা সূতা কাটা, ছেলেমেয়ের লালন-পালন থেকে আরম্ভ করে ইংরেজী ও রাজনৈতিক ব্যাকরণ পর্য্যন্ত শিখছে। এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রের রাজনৈতিক শিক্ষার মূল কথা অবশ্য কমিউনিজ্‌ম্; কিন্তু কমিউনিস্টদের আদর্শ ও কর্ম্মপন্থার সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রণ্ট ও সান-মিন নীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যারও ব্যবস্থা রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম চীনের এই ছোট্ট শহর ইয়েনান আজ চীনের প্রধান

শিক্ষাকেন্দ্র, অথচ ছ-সাত বৎসর পূর্ব্বে অধিকাংশ চীনবাসীর নিকট এ শহরটী ছিল অজ্ঞাত।

যুদ্ধারম্ভের পর জাপ-আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য যখন কমিউনিস্ট বাহিনী ইয়েনান থেকে পূর্ব্ব দিকে ও উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন সে-সব অঞ্চলে ইয়েনানের প্রাধান্য বর্দ্ধিত হতে আরম্ভ করে। আজ ইয়েনান গেরিলা বাহিনীদের প্রধান কেন্দ্রস্থল। শেনসি থেকে পূর্ব্ব দিকে পীত সাগর পর্য্যন্ত এবং হোনান ও হোপেই প্রদেশের পীতনদী থেকে উত্তরে সুদূর মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদের জাপ-বিরোধী কার্য্যকলাপ আজ ইয়েনান থেকে পরিচালিত।

যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে উত্তর চীনের অনেকাংশ জাপানীদের করতলগত হয়েছিল। কিন্তু পরে অষ্টম-রুট বাহিনী গেরিলা রণকৌশলের সাহায্যে সে-অঞ্চলের অধিকাংশ জনপদ জাপানীদের হাত থেকে উদ্ধার করে এবং ১৯৩৮-এর জানুয়ারী মাসে চিয়াংকাইসেকের সম্মতিক্রমে সেখানে চীনের দ্বিতীয় প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করে। শানসি-হোপেই-চাহার প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্ট নামে এ-গভর্ণমেণ্ট খ্যাত। শানসি, হোপেই ও চাহার—এই তিনটি প্রদেশের সতরটি জেলা নিয়ে সম্মিলিত ফ্রণ্টের ভিত্তিতে এই গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়। সমস্ত রাজনৈতিক পার্টির, সমস্ত শ্রেণীর ও সমস্ত সংখ্যালঘিষ্ঠের সমাবেশ এই গভর্ণমেণ্টে দেখা যায়। এই গভর্ণমেণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য জাপ-বিরোধী সংগ্রামের পরিচালনা ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনে ইহা একটি স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট—জনগণের সঙ্গে এ-গভর্ণমেণ্টের যোগাযোগ আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধকালীন গণতন্ত্র, স্বায়ত্ত-শাসন ও আত্মরক্ষার জন্য এই গভর্ণমেণ্ট জনগণকে সর্ব্বদিক দিয়ে শিক্ষিত ক'রে তুলছে। উপর থেকে আমলাতান্ত্রিক পন্থায় এই গভর্ণমেণ্টের আইনকানুন জনগণের উপর প্রবর্ত্তিত হয় না—আইনকানুন প্রবর্ত্তিত হয় জনসাধারণের দ্বারা তাদের নিজেদের গণ-প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এই সকল গণ-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কৃষকদের জাতীয় মুক্তিসঙ্ঘ, যুবকদের জাতীয় মুক্তিসঙ্ঘ, জাপ-বিরোধী যুবাদের অগ্রণী দল, শ্রমিকদের জাতীয়

মুক্তিসঙ্ঘ, নারীদের জাতীয় মুক্তিসঙ্ঘ, বণিকদের জাতীয় মুক্তিসঙ্ঘই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শানসি-হোপেই-চাহার প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্ট সুসংগঠিত ক'রে অষ্টম-রুট বাহিনী পূর্ব্বদিকে জাপ-অধিকৃত উত্তর শানটুং অভিমুখে অভিযান করে এবং কয়েকটি গ্রাম পুনরধিকার ক'রে সেখানে তৃতীয় প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করে। ধীরে ধীরে শানসি হোপেই-চাহার গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এই গভর্ণমেণ্টের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কমিউনিস্টদের পরিচালিত গেরিলা বাহিনী জাপ-অধিকৃত জেহোল প্রদেশে ও পূর্ব্ব হোপেইতে প্রবেশ ক'রে নিজেদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। কিন্তু সে-অঞ্চলে কোন রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করতে তারা সক্ষম হয় নি—অবশ্য জনগণের মধ্যে তাদের প্রাধান্য দিন-দিনই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। চতুর্থ প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্ট দক্ষিণ-শানসি, উত্তর-হোনান এবং দক্ষিণ-পশ্চিম হোপেই নিয়ে গঠিত। শানসি-হোনান-হোপেই প্রান্তীয় অঞ্চল নামেই এই গভর্ণমেণ্ট খ্যাত। এই গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত হয় কুয়োমিনটাং বাহিনী ও অষ্টম-রুট বাহিনীর দ্বারা। তবে প্রথম তিনটি প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের ন্যায় এই গভর্ণমেণ্টের জাপ-বিরোধী সামরিক কর্ম্মাবলী একটি কেন্দ্রীয় সামরিক নেতৃত্বে পরিচালিত নয়; শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য নয়টি জেলায় ইহা বিভক্ত। প্রত্যেক জেলার সামরিক কার্য্যকলাপ ও সৈন্যসমাবেশ বিভিন্ন রকমের—যে-জেলাগুলি অষ্টম-রুট বাহিনীর নেতৃত্বাধীনে সেখানকার সামরিক কার্য্যকলাপ ও সৈন্যসমাবেশ অন্যান্য প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টেরই অনুরূপ; কিন্তু যে-জেলাগুলি কুয়োমিনটাং বাহিনীর নেতৃত্বাধীনে সেখানে কুয়োমিনটাং-এর পুরাতন ব্যবস্থাই প্রচলিত।

এই সকল প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টগুলি চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন, কিন্তু কার্য্যত এগুলির উপর ইয়েনানের প্রভাব অত্যধিক। কমিউনিস্টরা নিজেদের কার্য্যকলাপের দ্বারা এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশ্বাস অর্জ্জন করেছে। জনগণ আজ তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে যে কমিউনিস্টরাই প্রকৃত গণতন্ত্রের উপাসক।

"একমাত্র সশস্ত্র জনগণ-ই জাতীয় স্বাধীনতার যথার্থ শক্তিস্তম্ভ হ'তে পারে"—লেনিনের এই উক্তির সার্থকতা লক্ষিত হয় চীনা কমিউনিস্টদের কার্য্যকলাপে। কমিউনিস্ট বাহিনী—অষ্টম-রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী—জাপ-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনায় তাদের সাহসিকতায়, শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও জাপ-অধিকৃত অঞ্চলে চীনের কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠায়, এবং তাদের গেরিলা রণ-কৌশলে জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছে। চীনে যখন জাপ-বিরোধী জাতীয় সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠিত হয়, তখন চীনের লাল ফৌজের নাম পরিবর্ত্তন ক'রে অষ্টম-রুট বাহিনী রাখা হয়। অন্তর্যুদ্ধের সময় যখন চিয়াংকাইসেকের পঞ্চম অভিযানের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষাকল্পে কমিউনিস্টরা কিয়াংশি-ফুকিয়েন প্রদেশ থেকে উত্তর-পশ্চিম চীনে ঘাঁটিস্থাপন করবার জন্য তাদের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "লং মার্চ" আরম্ভ করে, তখন সম্মুখ ভাগে চিয়াং-এর বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য কমিউনিস্টদের একটি বাহিনী কিয়াংশি-ফুকিয়েন প্রদেশেই থেকে যায়। এ-বাহিনীর লক্ষ্য ছিল চিয়াং-এর বাহিনীকে এমন ভাবে ব্যস্ত রাখা যাতে কমিউনিস্টদের উত্তর-পশ্চিম চীনাভিমুখে অভিযান চিয়াং-এর অনুচরদের অগোচরেই সম্পন্ন হয়। কমিউনিস্টদের কিয়াংশি-ফুকিয়েন প্রদেশ পরিত্যাগ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু চিয়াং-এর অভিযান প্রতিরোধকল্পে নিযুক্ত সেই কমিউনিস্ট বাহিনী কুয়োমিনটাঙ বাহিনীর আক্রমণে জর্জরিত হয়ে কিয়াংশি-ফুকিয়েনের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠিত হবার পরও তাদের পুনর্গঠনের অনুমতি কমিউনিস্টরা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে পায় নি। এ-অনুমতি কমিউনিস্টরা পেল নানকিং শহর পতনের পর। এই পুনর্গঠিত বাহিনীর নাম-ই নব চতুর্থ আর্মি। কমিউনিস্টদের এই দুইটি বাহিনী-ই জনগণের বৈপ্লবিক বাহিনী। সাধারণ বেতনভুক সৈনিকদের সঙ্গে এই বাহিনী দুইটির সৈনিকদের পার্থক্য বিশাল। এই বাহিনী দুইটির সৈনিকেরা অর্থ বা লুণ্ঠনের সামগ্রী বা উচ্চ পদের আশায় যুদ্ধ করছে না। তারা যুদ্ধ করছে একটি আদর্শের জন্য—সমাজের ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার মহৎ আদর্শে তারা উদ্বুদ্ধ। তারা সৈন্যবাহিনীতে যোগ

দিয়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহে নয়, বৃহত্তর আদর্শকে জয়যুক্ত করবার জন্য। এই বাহিনী দুটিতে সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে সমভাব বিদ্যমান—তাদের ভিতর শ্রমবিভাগ আছে, কিন্তু কোন শ্রেণীবিভাগ নেই; প্রত্যেকেরই একই অধিকার এবং প্রত্যেকেরই জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থা এক; কি সেনাপতি, কি সাধারণ সৈনিক—কারো বেতন নেই, তারা শুধু পায় খাদ্য-সামগ্রী, আর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সামান্য ভাতা; কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়ে সাধারণের মঙ্গলের জন্য এই ভাতাও তারা দিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। কমিউনিস্টদের মতে সৈন্যবাহিনী হচ্ছে, সশস্ত্র রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা-কল্পে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান! আর রাজনৈতিক নেতৃত্বই বৈপ্লবিক বাহিনীর প্রেরণা, চিন্তাধারা, জীবন-যাত্রা ও কর্ম্মধারার উৎস; সৈন্যগণ জনগণেরই হাতিয়ার। সুতরাং সৈন্য-বাহিনী আর জনসাধারণ একই পরিবারের সভ্য—পরস্পরের সুখ-দুঃখের তারা সমান অংশীদার। তাই কমিউনিস্ট বাহিনীর দৃষ্টি জনগণের স্বার্থের দিকেই বিশেষভাবে নিবদ্ধ। প্রত্যেকটি গ্রাম বা শহরের আত্মরক্ষাকার্য্যে প্রত্যেকটি নর-নারী ও শিশু যাতে নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করতে পারে, সেই দিকেই এই বাহিনী দুটির লক্ষ্য। প্রত্যেকটি সৈনিক এমনভাবে শিক্ষিত হয়, যাতে সে বুঝতে পারে, জাপ-বিরোধী সংগ্রামের উদ্দেশ্য কি এবং কখনো যেন ভুলে না যায় যে, সে সংগ্রাম করছে জনগণের জন্য। নতুন চতুর্থ বাহিনীর প্রধান নীতি হ'ল—"শেষ পর্য্যন্ত জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ বা তাদের সঙ্গে আপোসরফা কিছুতেই করা হবে না।" নব চতুর্থ আর্মির কর্ম্মধারা শুধু রণক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন রকমের স্লোগান, প্রাচীরপত্র, পত্রিকা এবং গান দিয়ে নেতৃবৃন্দ নিজেদের সৈনিকদের ভেতর সম্মিলিত ফ্রণ্টের আন্দোলনকে শক্তিশালী ক'রে তুল্‌ছে। রাজনৈতিক ঐক্য ব্যতীত যুদ্ধজয় অসম্ভব, যুদ্ধ জয়ের জন্য দেশব্যাপী সামগ্রিক জন-প্রতি-রোধের একান্ত প্রয়োজন, কমিউনিস্টরা একাই যুদ্ধ জয় করতে পারে না, আর আমরা শুধু আমাদেরই অগ্রগতি চাই না, আমরা চাই জাপানের বিরুদ্ধে

নিযুক্ত সমস্ত চীনা বাহিনীর অগ্রগর্তি—এই শিক্ষাই সৈনিকেরা নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। অষ্টম-রুট বাহিনী, নতুন চতুর্থ আর্মি থেকে অধিকতর উন্নত। জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধে কমিউনিস্টদের এই বাহিনীটি এক গৌরবময় ইতিহাস রচনা করেছে। আজ চীনের কোটি কোটি নরনারী বিশ্বাস করে যে, জাপানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়ের আশা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে অষ্টমরুট-বাহিনীর উপর। সামরিক কৌশলের চেয়েও এই বাহিনীটির নেতৃবৃন্দের বৈপ্লবিক চেতনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বাহিনীর সৈনিকদের শিক্ষার জন্য দু'টি বিভাগ আছে—রাজনৈতিক ও সামরিক। প্রত্যেক ইউনিটের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতা বিদ্যমান। যেখানে সামরিক নেতার কার্য্যের সমাপ্তি, সেখান থেকেই রাজনৈতিক নেতার কার্য্যারম্ভ। রণক্ষেত্রে সামরিক নেতার পরিচালনায় সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়; কিন্তু অন্যক্ষেত্রে সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারা এক-যোগে কাজ করে থাকে। প্রত্যেক ইউনিট-ই তার নিজস্ব সৈনিকদের কমিটি নির্ব্বাচিত ক'রে থাকে। এই কমিটির কাজ হচ্ছে, রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং নিজেদের শিক্ষার ও অ-সামরিক কার্য্যের পরিধি বিস্তৃত করা। লেখা-পড়া, সংস্কৃতিমূলক সঙ্ঘ পরিচালনা, খেলাধূলা, গান, অ-সামরিক অধিবাসীদের মধ্যে জাপ-বিরোধী প্রচারকার্য্য করা প্রভৃতির শিক্ষাও অ-সামরিক কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত। এই বাহিনীর সৈনিকদের যে-সব উপদেশ দেওয়া হয়, তার ভেতর শতকরা চল্লিশ ভাগই রাজনৈতিক, আর বাকী ষাট ভাগ সামরিক। এই বাহিনীতে সৈনিক যেদিন এসে যোগ দিল, সেই দিন থেকেই তার শিক্ষারম্ভ এবং সে-শিক্ষার আর সমাপ্তি নেই। নিজেদের উন্নতির জন্য সচেষ্ট এমন সৈন্যবাহিনী সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া আর কোথাও নেই।

রণক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের এই দুটি বাহিনীই বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। চীনে যত জাপানী সৈন্য বন্দী হয়েছে, তার এক-তৃতীয়াংশ বন্দী হয়েছে এই দু'টি বাহিনীর হাতে। ১৯৪০-এ চীনে জাপানের সর্ব্বসমেত ৪০টি ডিভিসন সৈন্য ছিল, কিন্তু তার ভিতর ১৭টি ডিভিসন সৈন্যই জাপানের রাখতে হয়েছিল এই দুটি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। ১৯৪৩-এ চীনে জাপানের

মোট সৈন্যসংখ্যার শতকরা ৫৮ ভাগ নিয়োজিত হয়েছিল কমিউনিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে কুয়োমিন্টাঙ বাহিনীর তুলনায় কমিউনিস্ট বাহিনী যে কত উন্নত, তার পরিচয় পাওয়া যায় যুদ্ধের ঘটনাবলীতে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব চীনে কুয়োমিন্টাঙ বাহিনীকে, আর উত্তর চীনে কমিউনিস্ট বাহিনীকে জাপানের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করা হয়েছিল। জাপ-আক্রমণে কুয়োমিনটাঙ বাহিনী পিছু হটে পশ্চিম চীনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু উত্তর চীনে কমিউনিস্ট বাহিনী অগ্রসর হ'য়ে জাপ-অধিকৃত অঞ্চলসমূহ পুনরধিকার ক'রে প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করেছে।

* * * *

২

দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে চীনের বিরাট বিরাট নগরী, সমুদ্রতটের প্রধান প্রধান বন্দর আজ জাপানের করতলগত। কিন্তু তবুও চীনকে জয় করা জাপানের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। চীনে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্র আজ জন-প্রতিরোধের আবর্ত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। চীনবাসীদের গেরিলা রণকৌশলে জাপান আজ ব্যতিব্যস্ত। জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে চীনের সামরিক শক্তি ও আর্থিক শক্তি এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধের গতিধারায় এ-কথা আজ প্রমাণিত যে, চীনের যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় হবে চীনের সামরিক শক্তির চেয়ে অধিকতর ভাবে চীনের আর্থিক শক্তির দ্বারা।

আর্থিক দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে চীনকে গরীব দেশই বলতে হয়। চীনবাসীদের জীবনযাত্রানির্ব্বাহের খরচ খুব কম। আমেরিকাবাসীরা প্রতি বৎসর মাখন কিনতে যত টাকা খরচ করে তা দিয়ে চীনের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে তাদের সমস্ত ব্যয়ভারের সুবন্দোবস্ত করা যায়। আর আমেরিকার জন-সংখ্যার প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে যে-পরিমাণ কফি প্রতি বৎসর পান করে, চীনের জন-সংখ্যার শতকরা দশজনও যদি সেই পরিমাণ কফি পান

করত, তবে চীনের অর্থভাণ্ডার এক বৎসরের যুদ্ধেই নিঃশেষ হয়ে যেতো। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সেই আফিংখোর চীন আর নেই—চীন আজ জাগ্রত, দেশরক্ষা সম্বন্ধে চীন আজ সজাগ।

যুদ্ধে চীনের আর্থিক শক্তি দু'টি জিনিসের মধ্যে নিহিত: চীনবাসীদের সহজ সরল জীবনযাত্রা, তাদের খাদ্যদ্রব্যের সহজ চাহিদা এবং সে-চাহিদা পূরণে তার আর্থিক স্বচ্ছলতা ও আত্মনির্ভরতা। চীনদেশ ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান—তাই জন-প্রতিরোধের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় রাখার অর্থ, প্রথমত, সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণের খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষিকার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং, দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় শিল্প-সামগ্রী ও সৈন্যদের সমরসম্ভার উৎপাদনের জন্য শিল্পব্যবস্থায় যথোপযুক্ত উন্নতি বিধান। এ-কার্য্য সুসম্পন্ন করবার জন্য কমিউনিস্টরাই প্রথমে এগিয়ে আসে। কমিউনিস্টরা শুধু গেরিলা রণকৌশলের স্রষ্টা নয়, যুদ্ধকালীন আর্থিক সংগঠনের তারাই পথ-প্রদর্শক।

উত্তর চীনে কমিউনিস্টদের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় যে-সকল প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়েছে, সেগুলির প্রধান সমস্যা ছিল আর্থিক সমস্যা। প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ জনপদে দেশীয় শিল্প, কলকারখানা প্রভৃতি না থাকায় জাপানীদের প্রথমে খুব সুবিধে হয়েছিল; তারা তাদের সস্তা শিল্পসামগ্রী দিয়ে এই সকল জনপদের অধিবাসীদের শোষণ করতে আরম্ভ করে। রণক্ষেত্রে যদিও কমিউনিস্ট বাহিনী জাপ-বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত করছিল, কিন্তু জাপানীদের এই আর্থিক অভিযানে কমিউনিস্টদের গেরিলা রণকৌশলের ভিত্তি কেঁপে ওঠে। কারণ কমিউনিস্টদের গেরিলা রণকৌশলের ভিত্তি হচ্ছে প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ জনপদসমূহ। সুতরাং সেখানকার অধিবাসীদের যদি জাপানীরা সস্তা পণ্যসামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে তাদের প্রতিরোধশক্তিকে খর্ব্ব করতে আরম্ভ করে, তবে গেরিলা বাহিনীদের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার, তা কমিউনিস্টরা খুব ভালো ভাবেই বুঝেছিল। তারা তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিল যে, চীনা কৃষকেরা দেশরক্ষার জন্য সে-পর্য্যন্তই যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করবে যে-পর্য্যন্ত তারা তাদের শ্রমে উৎপন্ন

পণ্যের বিনিময়ে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী—যথা কাপড়, জুতা, তামাক, ঔষধ, জ্বালানী, তেল, কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কিনতে পারবে। কিন্তু যখন অধিক কালের জন্য এ-সব জিনিস তারা বাজারে পায় না তখন, তাদের প্রতিরোধশক্তি ধীরে ধীরে দুর্ব্বল হ'তে থাকে, তাদের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হতে আরম্ভ করে। সে-সময়ে যদি সস্তা জাপানী জিনিসের আমদানী হয়, তবে তো আর কথাই নেই। তাই যখন রণক্ষেত্রের সীমানা অতিক্রম করে জাপানী সস্তা পণ্যদ্রব্য প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টের অঞ্চলে প্রবেশ করতে আরম্ভ করল, তখন কমিউনিস্টরা দেখল, জাপানী পণ্যদ্রব্যের আমদানী জোর করে বন্ধ করলে ফল ভালো হবে না ; জাপানীদের এই আর্থিক অভিযান প্রতিহত করবার জন্য চাই দেশব্যাপী শিল্পোন্নতির প্রসার ও জনগণের আথিক চাহিদার পূরণ। জনসাধারণের চাহিদা ছাড়া আরো কতকগুলি সমস্যা তখন উপস্থিত হয়েছিল। রণক্ষেত্রে সৈন্যদেরও রীতিমত রসদ ও নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী পাঠাতে হচ্ছিল। ১৯৩৯-এ আবার জাপ-অধিকৃত অঞ্চল থেকে চীনারা দলে দলে প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত অঞ্চলে এসে উপস্থিত হতে আরম্ভ করল। এর উপর হোপেই, সানটুঙ ও শানসী প্রদেশে বন্যার ফলে শত শত গ্রামবাসী গৃহহারা হ'য়ে প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে এসে উপস্থিত হয়। কমিউনিস্টরা দেখল যে, এই সকল জনসাধারণকে যদি আশ্রয় ও কাজ না দেওয়া যায় তবে তারা জাপ-অধিকৃত অঞ্চলে ফিরে গিয়ে জাপানের কলকারখানায় মজুর হিসাবে কাজ ক'রে জাপানের রণসম্ভার বৃদ্ধি করবে। ইতিমধ্যে প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত অঞ্চলের প্রাকৃতিক ধনসম্পদ অব্যবহার্য্য হয়ে পড়েছিল ; সেগুলি ব্যবহার করবার মত কোন ব্যবস্থা-ই ছিল না। সে-ব্যবস্থা করতে প্রয়োজন মূলধনের ; কিন্তু সে-মূলধনও কমিউনিস্টদের ছিল না। চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টও এ-বিষয়ে কমিউনিস্টদের বিশেষ কোন সাহায্য করেনি। চীনের সাতটি প্রদেশের অনেক অঞ্চলই গেরিলা বাহিনীর অধিকারে এবং সামরিক দিক দিয়ে এই সকল অঞ্চলই যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্রস্থল। এই সকল অঞ্চলে শিল্পোন্নতির জন্য মূলধনের অভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এ-সমস্যাগুলির সমাধান কমিউনিস্টরা খুব

ভালো ভাবেই করেছিল—সমস্যার সম্মুখে তারা নিরুপায় হয়ে নিশ্চুপ বসে থাকে নি। তারা অগ্রসর হ'য়েছে সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে ; তাদের লক্ষ্য যে জাপানের আক্রমণ প্রতিহত করা, তা তারা কোন সময়েই ভুলে যায় নি।

চীনে অন্তর্যুদ্ধের সময় (১৯২৭-৩৬) কমিউনিস্টরা যুদ্ধকালীন অর্থনীতি হিসাবে ক্ষুদ্রাকারে সমবায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের যথোপযুক্ততা উপলব্ধি করেছিল। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ও তারা সেই অর্থনীতি-ই প্রয়োগ করল। "ইয়েনান"কে কেন্দ্র ক'রে প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্ট শাসিত অঞ্চলসমূহে কমিউনিস্টরা সমবায় শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করল। যদিও তাদের মূলধন খুবই অল্প ছিল, তবুও তাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার ফলে তাদের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হয়। এই সকল সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ দুই প্রকারের : পণ্য-উৎপাদনকারীদের সমবায়-সমিতি আর পণ্য-ব্যবহারকারীদের সমবায়-সমিতি। এই সকল সমবায় সমিতি-গুলি এমনভাবে পরিচালিত যে, এগুলিকে জনসাধারণের প্রকৃত গবর্ণমেণ্ট আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত নয়। এই সকল সমবায়-সমিতিগুলির সভ্যসংখ্যা এক লক্ষ পরিবারের অধিক। ১৯৩৯-এ পণ্য-উৎপাদনকারী সমবায়-সমিতির সভ্যসংখ্যা ছিল ২৮,৩২৬। সমবায়-সমিতিগুলির চতুঃপার্শ্বে সমস্ত গ্রাম্যজীবনকে কমিউনিস্টরা আর্থিক শক্তি হিসাবে কেন্দ্রীভূত করেছিল। ১৯৩৮-এ হ্যাঙ্কাউর পতনের সময় চিয়াংকাইসেক চীনের আর্থিক উন্নতির জন্য রিওয়াই এলে-র পরিকল্পনানু-যায়ী যে-সকল সমবায়-সমিতি স্থাপন করেন, কমিউনিস্ট-শাসিত অঞ্চলে সে-গুলির প্রসারের পথে কুয়োমিন্টাঙ-এর কর্ত্তৃপক্ষ প্রবল বাধা সৃষ্টি করে রাখে। সে-বাধা আজও অপসারিত হয় নি। কিন্তু এ-বাধা সত্ত্বেও কমিউনিস্টরা তাদের নিজেদের সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী ক'রে গেরিলা বাহিনীর প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির আর্থিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। এ-কার্য্যে কমিউনিস্টরা জাভা ও ফিলিপাইনে প্রবাসী চীনাদের কাছ থেকে চার লক্ষ ডলার আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল। এ-ভাবে শেনসী-কানসু-নিঙশিয়া প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্ট আর্থিক ক্ষেত্রে কিয়ৎ পরিমাণে আত্ম-নির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে—বিশেষ ক'রে শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনে। ১৯৪০-এর অক্টোবরে

এ-অঞ্চলে আশীটি নতুন সমবায়-সমিতি স্থাপিত হয়—এ-গুলির মধ্যে লৌহখনি, কয়লাখনি, লৌহকার্য্য, যন্ত্রপাতির কার্য্য ও দোকান, পণ্য আমদানী-রফ্‌তানী, তৈলের দুইটি ক্ষুদ্র কূপ, অষ্টম রুট বাহিনীর সৈন্যদের ও স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য খেলার জিনিস জোগানো প্রভৃতি সমিতি-ই উল্লেখযোগ্য। সংক্ষেপে ইয়েনান উত্তর চীনের গেরিলা শিল্পভিত্তির আশাস্থল হ'য়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধজয়ের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প, একাগ্রতা ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই কমিউনিস্টরা প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টের আর্থিক সমস্যাগুলির কিঞ্চিৎ সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে।

রণক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের রণকৌশলে জাপ-সৈন্য আজ সন্ত্রস্ত। অন্তর্যুদ্ধের সময় (১৯২৭-৩৬) চিয়াংকাইসেকের ছ'টি অভিযান ব্যর্থ করে দিয়ে তিন লক্ষের উপর কমিউনিস্টের আত্মোৎসর্গে যে-যুদ্ধনীতির অভিজ্ঞতা চীনের লালফৌজ অর্জন করেছিল, সেই রণনীতিই কমিউনিস্টরা জাপানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করছে। এ-রণনীতির মূল কথা হচ্ছে—"দীর্ঘস্থায়ী সামগ্রিক জন-প্রতিরোধ।" চীনের অগণিত জনসংখ্যা ও বিশাল জনপদের ব্যবহারের উপরই এ-রণনীতির ভিত্তি স্থাপিত। দীর্ঘদিন যুদ্ধের ফলে জাপান উত্তর চীনের অনেকাংশই অধিকার করেছে। এই অধিকৃত অঞ্চলের গ্রামের সংখ্যা ছ' লক্ষেরও বেশী। কিন্তু তিন লক্ষ গ্রামের উপর দৃষ্টি রাখবার মত সৈন্যসংখ্যা জাপানের ছিল না, এবং তা করতে যাওয়া ছিল জাপানের পক্ষে ধ্বংসাত্মক। তাই জাপানীরা বড় বড় শহর ও প্রধান প্রধান রেলওয়ে-কেন্দ্রগুলিতেই তাদের ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। কমিউনিস্টরা এই সব জাপানী ঘাঁটিগুলিকেই তাদের আক্রমণের কেন্দ্র ক'রে নিল; তাদের লক্ষ্য অধিকৃত অঞ্চলের প্রত্যেকটি গ্রামকে জন-প্রতিরোধের কেন্দ্রে পরিবর্ত্তিত করা।

কমিউনিস্টদের রণনীতি তিন প্রকারের: (১) গেরিলা যুদ্ধ; (২) গতিযুদ্ধ (Mobile warfare); (৩) কৌশলযুদ্ধ (Manœuvreing warfare) প্রথমোক্ত দু'টি সম্পূর্ণভাবে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ এবং এই দু'টি যুদ্ধে বিপর্য্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আত্মরক্ষামূলক নীতি হচ্ছে দ্রুতগতিতে ও সুসংবদ্ধ ভাবে রণক্ষেত্র থেকে সরে আসা। শুধুমাত্র কৌশলযুদ্ধে কমিউনিস্টরা

আত্মরক্ষার প্রস্তুতির জন্য একটি স্থানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও সেই আত্মরক্ষার স্থানটি সামরিক ; সৈন্য অপসরণ বা আক্রমণের আক্র হিসাবে যখন সেই স্থানটির কার্য্যকারিতা শেষ হ'য়ে যায়, তখন তারা সে স্থানটি ত্যাগ করে। কোন যুদ্ধেই কমিউনিস্টরা শত্রুর অধিকতর রণসম্ভারে সজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি ঘাঁটি রক্ষার জন্য দীর্ঘকাল প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালায় না। সব সময়ে আক্রমণাত্মক নীতির প্রয়োগ ও সৈন্যসমাবেশের দ্রুত গতি—এখানেই কমিউনিস্টদের বাহিনীর সঙ্গে চীনের অন্যান্য বাহিনীর পার্থক্য।

অবিশ্রান্ত আক্রমণ ও নিরন্তর গতি—এ দু'টি জিনিস বজায় রাখাই গেরিলা যুদ্ধের মূল কথা। কমিউনিস্ট গেরিলা-যোদ্ধাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক শিক্ষা। গেরিলা যোদ্ধা যে সব সময়-ই সামরিক পোসাক পরিধান করে, তা নয় ; অনেক সময় তারা সাধারণ পোসাক-ই পরিধান করে, দিনের বেলা গ্রামের কৃষিকার্য্য করে আর রাত্রিবেলা সৈনিক হিসাবে জাপানীদের সামরিক ঘাঁটি আক্রমণ করে। যদি সামরিক অবস্থা অনুকূলে না থাকে, তবে অনেক দিন পর্য্যন্ত তারা কোন সামরিক কাজ করে না, কিন্তু গ্রামবাসীর প্রতিরোধশক্তি জাগ্রত করবার জন্য শত্রুর বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতি করতে থাকে—কখনও তারা জাপানীদের টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন কেটে দেয়, জাপ-সৈন্যদের চলাচলের পথে বিরাট বিরাট গর্ত্ত খুঁড়ে রাখে, পথের সেতু ভেঙ্গে ফেলে এবং বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে। জাপ-বাহিনীর লাইনের অপর পারেই গেরিলা যোদ্ধাদের ঘাঁটি। যখন সুবিধা পায় তখন কয়েকটি গ্রামের গেরিলা যোদ্ধারা একত্রিত হয়ে অতর্কিতে জাপানীদের আক্রমণ ক'রে তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেয়। এ-ভাবে গেরিলা যোদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কখনও বা শত্রুশিবিরে গুপ্তচর হিসাবে প্রবেশ ক'রে তাদের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে এবং শত্রুর ধ্বংসের ব্যবস্থা করে। চীনের যুদ্ধে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের পৈশাচিক বর্ব্বরতার চরম নিদর্শন ঃ জাপ-সৈনিকদের নারীধর্ষণ—নারীর উপর অত্যাচারের জন্য জাপ-সৈনিকেরা সর্ব্বদাই উৎসুক। তাই গেরিলা যোদ্ধারা অনেক সময় নারীবেশে জাপ-সৈন্যদের

ভুলিয়ে গ্রামে নিয়ে আসে এবং তাদের হঠাৎ আক্রমণ ক'রে হত্যা করে। আবার কখনও বা গ্রামের পর্ব্বত-প্রান্তরে গরু ও ভেড়া গেরিলা যোদ্ধারা এমন-ভাবে সাজিয়ে রাখে, যাতে তার উপর জাপ-সৈনিকদের দৃষ্টি পড়ে। মাংসের লোভে যখন জাপ-সৈনিকেরা সেই পর্ব্বত-প্রান্তরে উপস্থিত হয়, তখন গেরিলা যোদ্ধারা তাদের হঠাৎ আক্রমণ ক'রে হত্যা করে। এ-রকম বিবিধ উপায়ে গেরিলা যোদ্ধারা আজ চীনে জাপ-হত্যাকারী হিসাবে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছে।

গতি যুদ্ধের ক্ষেত্র অধিক বিস্তৃত এবং কমিউনিস্ট বাহিনীর সৈনিকদের দ্বারা সে-যুদ্ধ পরিচালিত। এ-যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত প্রস্তুতি, গতি ও গোপনীয়তা। এ-যুদ্ধ বিশিষ্টস্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেই বিশিষ্ট স্থানটি স্থির করাই হচ্ছে কঠিন কাজ। জাপ-বাহিনীর দুর্ব্বলতম স্থানটি বেছে নিয়ে সেখানেই কমিউনিস্টবাহিনী প্রথমে আক্রমণ করে। উদাহরণ স্বরূপ চীনের প্রাচীরের পিঙ-সিঙ-গিরিবর্ত্মের যুদ্ধকেই যথার্থ গতিযুদ্ধ বলা যেতে পারে। এ-যুদ্ধে অষ্টমরুট-বাহিনী জাপানীদের দু'টি ডিভিসনকে হটিয়ে দিয়েছিল— অষ্টমরুট-বাহিনীর মাত্র ৩০০ সৈন্য আর জাপানীদের ৬৪০০ সৈন্য প্রাণ হারিয়েছিল।

কৌশল-যুদ্ধ তখনই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা যেতে পারে, যখন জনগণের মধ্যে সংগঠনকার্য্য এক উচ্চ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। এ-যুদ্ধে জাপ-সৈনিকদের পিছনে চীনের স্বাধীন জনপদের বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে চীনা সৈন্যদের আক্রমণকে সুসংবদ্ধ ও ক্ষীপ্রতর করা প্রয়োজন।

উত্তরচীনে বর্ত্তমানে অষ্টমরুট বাহিনীর বারোটি ঘাঁটি আছে। প্রত্যেকটি ঘাঁটির চতুর্দ্দিকে জাপ-বিরোধী সঙ্ঘ বিদ্যমান। যখনই জাপ-সৈনিকেরা একটি ঘাঁটি আক্রমণ করে, তখনই অন্য ঘাঁটি থেকে চীনা সৈন্য জাপ-সৈনিকদের আক্রমণ করে। অবশ্য যদি একই সময়ে জাপ-বাহিনী সমস্ত ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করে, তবে কমিউনিস্ট বাহিনীর পক্ষে প্রচুর অসুবিধা হয়; কিন্তু সে-রকম আক্রমণের জন্য প্রচুর সৈন্যের প্রয়োজন—উত্তর-চীনে সে-সৈন্যসংখ্যা

জাপানের নেই। কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন রীতিমত সংবাদ সরবরাহ এবং সময়মত আক্রমণ। যদিও এ-কৌশলযুদ্ধে কমিউনিস্ট বাহিনী সব ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে পারে নি, কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করবার নয় যে, এই কৌশলযুদ্ধ দিয়ে কমিউনিস্ট বাহিনী জাপানীদের অনেক পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

উপরের বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যদি চীনে কমিউনিস্টদের কোন বাহিনী না থাকত, আর যদি কমিউনিস্টরা গেরিলা রণকৌশল জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করত তবে চীনে জাপানীদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত হ'ত। আত্মত্যাগ ও রণকৌশল দিয়ে চীনা কমিউনিস্টরা আজ প্রমাণ করেছে যে ফাশিস্ট বর্ব্বরদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে কমিউনিস্টরাই বীর যোদ্ধা। সম্মিলিত ফ্রন্টের বিস্তারে, গণতন্ত্রের প্রসারে এবং গেরিলা রণকৌশলের প্রয়োগে চীনা কমিউনিস্টরা রচনা করেছে এক বিস্ময়কর ইতিহাস। কিন্তু অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা উপলব্ধি করেছে যে, তাদের চলার পথে বিঘ্ন শুধু জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্র নয়, কুয়োমিন্টাঙ-এর পুরাতন কমিউনিজ্ম্-বিরোধী মনোভাবও। চীনের জাতীয় ঐক্যের পথে সেইটিই বিশেষ অন্তরায়। কিন্তু জাতীয় ঐক্য ব্যতীত যুদ্ধজয় অসম্ভব।

জাতীয় ঐক্যের পথে অন্তরায়

ফাশিস্ট অভিযানকারীরা তাদের বিজয়ের পথে শুধু সামরিক শক্তি ও তাদের রণনীতির উপরই নির্ভর করে না—তাদের সাফল্য নির্ভর করে একটি রাজনৈতিক অস্ত্রের উপর। সেটি হচ্ছে "পঞ্চম বাহিনী"। স্পেনে গণতন্ত্রের উচ্ছেদকল্পে ফাশিস্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কো চারটি বাহিনী নিয়ে স্পেনকে আক্রমণ করেছিল। স্পেনের সে-যুদ্ধে (১৯৩৮-৩৯) ফ্রাঙ্কোর অনুচরবৃন্দেরা রণক্ষেত্রের পিছনে স্পেনের অভ্যন্তরে গোপনে ধ্বংসাত্মক ও বিদ্রোহাত্মক কার্য্য

ক'রে ফ্রাঙ্কোর অভিযানের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। ফাশিস্টদের এই অনুচরবৃন্দেরাই পঞ্চম বাহিনী নামে অভিহিত। নাৎসী নেতা হিটলারের নিকট ফ্রান্সের নতি স্বীকারের মূলেও ছিল এই পঞ্চম বাহিনীর কার্য্যকলাপ। প্রতি দেশেই পঞ্চম বাহিনীর সাহায্যে ফাশিস্ট দস্যুদল তাদের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে নেয়। অর্থাৎ জাতীয় ঐক্যের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ফাশিস্ট দস্যুদলের অভিযানের সাফল্যের প্রধান কথা। যে-দেশে জাতীয় ঐক্য বিদ্যমান, সে-দেশে ফাশিস্ট দস্যুদলের নরমেধযজ্ঞের রথচক্রের গতি জনপ্রতিরোধে প্রতিহত হয়। প্রমাণ স্বরূপ সোভিয়েট রাশিয়ায় হিটলারী জার্মানীরএবং চীনে জাপ-সাম্রাজ্য-তন্ত্রের অভিযানের ব্যর্থতার উল্লেখ করা যেতে পারে.

সোভিয়েট রাশিয়ার জাতীয় ঐক্যের সঙ্গে চীনের জাতীয় ঐক্যের পার্থক্য বিশাল। সোভিয়েট রাশিয়ায় সোশালিজ্‌ম্‌ সুপ্রতিষ্ঠিত, আর চীন দেশ এখনো বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে। সুতরাং সোভিয়েট রাশিয়ায় জাতীয় ঐক্য যত সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, চীনে তত সহজে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার আশা করা অসঙ্গত। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে সোভিয়েট রাশিয়ার আর চীন দেশের সমস্যা বিভিন্ন। সোভিয়েট রাশিয়া শ্রমিকদেরই রাষ্ট্র; একটি মাত্র শ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী সেখানে বিদ্যমান। সুতরাং সোভিয়েট রাশিয়ায় বিভিন্ন জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারে যে-জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল তার ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতে পারত একমাত্র ফাশিস্টদের পঞ্চম বাহিনী; কিন্তু হিটলারী জার্মানীর রুশ অভিযান আরম্ভের বহু পূর্ব্বেই সোভিয়েট রাশিয়ায় ফাশিস্টদের পঞ্চম বাহিনীর ধ্বংস সাধন হয়েছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মস্কোর চারটি বিচারই (আগষ্ট ১৯৩৬, জানুয়ারী ১৯৩৭, জুন ১৯৩৭, মার্চ ১৯৩৮) তার সাক্ষ্য দেয়। সে-চারটি বিচারে দণ্ডিত নেতারা অনেকেই রুশ-বিপ্লবের ইতিহাসে বিখ্যাত এবং লেনিনের সময় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকলেও রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও স্টালিনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছিল। মস্কোর বিচারে দণ্ডিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি অধিকাংশই সাজানো বলে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় সেদিন বিরাট কলরব উঠেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে

পশ্চিম ইউরোপে হিটলারের সেনাদলের সাফল্য এবং পূর্ব্ব ইউরোপে—রাশিয়ায়—হিটলারের ব্লিৎস্ক্রীগ অভিযানের ব্যর্থতা দেখে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় সেই কলরব-উত্থাপনকারীরাই প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে, মস্কোর বিচার স্টালিনের নেতৃত্বের দূরদর্শিতারই পরিচয়। তাই হিটলারের রুশ-অভিযানের প্রারম্ভে সোভিয়েট রাশিয়ার জাতীয় ঐক্য ছিল সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে অবস্থা ছিল বিভিন্ন—জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে যখন চিয়াংকাইসেক তাঁর কমিউনিস্ট-দমন অভিযানের বিরতি ঘটিয়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনে উদ্যোগী হলেন, তখনই আরম্ভ হয় জাপানের চীন-অভিযান। চীনের জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছে যুদ্ধের মধ্যে। কিন্তু সে-ঐক্য আজও সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত নয়। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কমিউনিস্টরাই অগ্রণী হয়েছে। জাপ-অভিযান প্রতিরোধকল্পে জাতীয় ঐক্য শক্তিশালী করতে কমিউনিস্টরা সর্ব্বদাই সচেষ্ট। কিন্তু তাদের এই কর্ম্মপ্রচেষ্টার পথে বাধাবিঘ্ন প্রচুর। এই বাধাবিঘ্নের মূলে রয়েছে চীনের জাতীয় দল কুয়োমিন্টাঙ-এর কার্য্যকলাপ এবং সে-কার্য্যকলাপের প্রাণবস্তু হচ্ছে কমিউনিজ্ম্-ভীতি।

চীনের জাতীয় দল, কুয়োমিন্টাঙ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কুঙচান্টাঙ এর উপরেই জাতীয় জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্টের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। শ্রেণীস্বার্থের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে এই দুইটি পার্টির স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত—কুয়োমিন্টাঙ চীনের জমিদার, ধনিক প্রভুদেরই পার্টি; আর কুঙচান্টাঙ চীনের শ্রমিক-কৃষকদের পার্টি। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষায় জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের খপ্পর থেকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে এই দু'টি পার্টি একটি জাতীয় ফ্রণ্টে একত্রিত হ'তে দ্বিধা করে নি। এই দু'টি পার্টির ভিতর কুয়োমিন্টাঙ-ই বৃহত্তর—কুয়োমিন্টাঙ-এর সাহায্য ব্যতিরেকে জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে চীনের জনসাধারণকে সমাবেশ করা অসম্ভব ছিল। এ-কথা অস্বীকার করবার নয় যে, জাতীয় জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্ট সংগঠনে ও জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ করতে কুয়োমিন্টাঙ নেতার স্থান অধিকার ক'রে আছে। কিন্তু যুদ্ধকালে নেতার যথোপযুক্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে কুয়োমিনটাঙ সক্ষম হয় নি। জাপ-

আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে জাতীয় ঐক্যই যে প্রধান হাতিয়ার এ-কথা কমিউনিস্টদের সঙ্গে সঙ্গে কুয়োমিনটাঙ-নেতা চিয়াংকাইসেক যুদ্ধের প্রথম স্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু কুয়োমিনটাঙ-এর ভিতর প্রগতিপরিপন্থীদের কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে তাদের পূর্ব্বতন মত এখনো পরিবর্ত্তিত হয় নি। তাই জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করার পথে কুয়োমিন্‌টাঙ-এর এই দক্ষিণপন্থীদের কাছ থেকে কমিউনিস্টরা প্রতিনিয়তই বাধা পাচ্ছে। অবশ্য যুদ্ধের প্রথম স্তরে চিয়াংকাইসেক এই বাধা অপসারিত করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলকামও হয়েছিলেন। কিন্তু এই দক্ষিণপন্থীদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে কুয়োমিন্‌টাঙ-এর সংস্কার করবার মত সামর্থ্য চিয়াংকাইসেকের নেই এবং বর্ত্তমানে চিয়াংকাইসেকের উপর দক্ষিণপন্থীদের কর্ত্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত। যদিও যুদ্ধের বিভিন্ন স্তরে কুয়োমিন্‌টাঙ প্রগতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কুয়োমিন্‌টাঙ ও তার শাখা-প্রশাখার সংগঠনের এবং চীনের বিভিন্ন জাপ-বিরোধী পার্টিগুলিকে কুয়োমিন্‌টাঙ-এর ভিতরে এনে শত্রু-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে ও জাতীয় সংগঠনের জন্য কুয়োমিন্‌টাঙকে জনসাধারণের একটি যথার্থ জাতীয় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে উন্নত করবার কোন চেষ্টাই হয় নি। অথচ জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে এই ছিল কুয়োমিনটাঙ-নেতাদের প্রধান কাজ। এ-কাজটির জন্য কমিউনিস্টরা বারবার প্রস্তাব করেছে; তারা এ-পর্য্যন্ত বলেছে যে, যদি কুয়োমিন্‌টাঙ-এর দ্বার চীনের বিভিন্ন জাপ-বিরোধী পার্টির সম্মুখে উন্মুক্ত হয়, তবে কমিউনিস্টরা সানন্দে কুয়োমিনটাঙ-এ যোগদান করবে এবং যোগদানকালে তারা তাদের পার্টি-সভ্যদের তালিকা কুয়োমিন্‌টাঙ-এর হাতে দিয়ে দিবে। কুয়োমিন্‌টাঙ-এর ভিতর গিয়ে তার কোন সভ্যকেই কমিউনিস্ট পার্টির ভিতর টেনে আনবে না, আর যদি কোন কুয়োমিনটাঙ-সভ্য কমিউনিস্ট পার্টির ভিতর আসতে চায় তবে তাকে সম্মিলিত ফ্রণ্টের জন্য সে-পথ গ্রহণ না করতে উপদেশ দেওয়া হবে—এরূপ অঙ্গীকার করতেও কমিউনিস্টরা স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে-কাজ সুনইয়াৎসেন ১৯১১ ও ১৯২৪ সালে করতে সক্ষম হয়েছিলেন, জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে

চিয়াংকাইসেক সে-কাজ করতে সক্ষম হন নাই। এর প্রধান কারণ কুয়োমিনটাঙ-এ প্রগতি-পরিপন্থীদের প্রাধান্য ও তাদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব।

চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে কুয়োমিন্‌টাঙ-এরই একাধিপত্য—যুদ্ধের ফলেও এর কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। যদিও হাঙ্কাউর পতনের পর জাপানের সঙ্গে আপোস-কামী দল (ওয়াং-চিং-ওয়াই ও তার অনুচরবৃন্দ) কুয়োমিনটাঙ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, কিন্তু প্রগতি-পরিপন্থীদের প্রাধান্য তাতে ক্ষুণ্ণ হয় নি। কুয়োমিন্‌টাঙ-এর ভিতর বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের সমন্বয় সাধনের এবং জাতীয় জীবনের অন্যান্য জাপ-বিরোধী দলগুলির সঙ্গে কুয়োমিন্‌টাঙ-এর সম্বন্ধ বজায় রাখার দায়িত্ব চিয়াংকাইসেকের উপর পড়েছিল। জাতীয় ঐক্য বজায় রাখবার জন্য চিয়াংকাইসেক প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রগতি-পরিপন্থীদের রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলে এমন সব ঘটনা ঘট্‌লো যাতে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করতে গিয়ে কমিউনিস্টরা প্রতিপদে বাধা পেল।

শত্রুর হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনায় ও শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে সামরিক পরিকল্পনায় জাপ-বিরোধী সমস্ত পার্টির মতামত গ্রহণ করা যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য, এ-কথা চিয়াংকাইসেক কমিউনিস্টদের প্রচারকার্য্যের ফলে খুব ভালো ভাবে বুঝেছিলেন। তাই হাঙ্কাউর পতনের পূর্ব্বেই তিনি "জনসাধারণের রাজনৈতিক পরিষদের" (চীনের যুদ্ধকালীন পার্লামেণ্ট) অধিবেশনের ব্যবস্থা করেছিলেন। দেশের সমস্ত জাপ-বিরোধী পার্টিরই এই পরিষদে যোগদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক পরিষদে কমিউনিস্টদের প্রভাব-প্রতিপত্তি যাতে প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে তার জন্য পূর্ব্ব থেকেও কুয়োমিন্‌টাঙ-এর প্রগতি-পরিপন্থী আমলাতান্ত্রিক ধুরন্ধরগণ চীনে বিলুপ্ত কতকগুলি রাজনৈতিক দলকে পুনরুজ্জীবিত করতে আরম্ভ করে। এদের ভিতর সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টি, যুবা:চীন পার্টি, ন্যাশনাল সোশালিস্ট পার্টি ও থার্ড পার্টিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল রাজনৈতিক দলগুলির যদিও কোন গণভিত্তি ছিল না, তবুও জনসাধারণের রাজনৈতিক পরিষদে কমিউনিস্টদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ

করবার জন্যেই এদের আবির্ভাব। অন্যদিকে এই পরিষদের ডেলিগেট নির্ব্বাচিত হল ভৌগলিক সীমানা হিসাবে। কমিউনিস্ট পার্টি মাত্র সাত জন ডেলিগেট পাঠাতে পেরেছিল। অন্য অন্য রাজনৈতিক দলগুলিও অনুরূপ অধিকার পেয়েছিল। দুই শত ডেলিগেটের ভিতর কুয়োমিন্‌টাঙ-এর মনোনীত সংখ্যাই অধিক। কুয়োমিনটাঙ-এর কার্য্যকরী সমিতির ৭০ জন সভ্যও এই মনোনীত ডেলিগেটের ভিতর স্থান পেয়েছিল। শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, এমন কি, ছাত্রদল পর্য্যন্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পায় নি। সুতরাং জনসাধারণের রাজনৈতিক পরিষদে কুয়োমিন্‌টাঙ-এর আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত থাকলো। এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন ওয়াং চিংওয়াই—তখনো তার যথার্থ স্বরূপ চীনবাসীর নিকট উদ্ঘাটিত হয় নি। ওয়াং-এর উদ্দেশ্য ছিল কুয়োমিন্‌টাঙ-এ নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ক'রে জাপানের সঙ্গে চুক্তি করা। কমিউনিস্টদের সঙ্গে কুয়োমিন্‌টাঙ-এর জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্ট সৃষ্টি তাঁর মনঃপুত হয় নি এবং এই সম্মিলিত ফ্রন্টের ভিতর বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে তিনি প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিলেন। হ্যাঙ্কাউর পতনের পূর্ব্বে তিনি ও তাঁর অনুচরেরা কুয়োমিন্‌টাঙ-এর প্রগতি-পরিপন্থী ও দেশের ভিতর ট্রটস্কী-পন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। রাজনৈতিক পরিষদের কমিউনিস্ট সভ্যদের পিছনে গুপ্তচর নিযুক্ত করা হ'ল, তাদের জনগণের কোন সভা করবার বা কোথাও জনগণকে সংগঠিত করবার অনুমতি দেওয়া হ'ল না। প্রতিপদেই কমিউনিস্টদের বাধা দেবার ব্যবস্থা হল। হ্যাঙ্কাউতে যখন চীনের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়, তখন হ্যাঙ্কাউ জীবনের লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল কমিউনিস্টদের প্রতি জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান শ্রদ্ধা। অষ্টম রুট-বাহিনীর কর্ম্মপন্থা ও রণনীতি জানবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আগ্রহের সঞ্চার হয়েছিল। আর তখন কমিউনিস্ট-শাসিত অঞ্চলের রাষ্ট্রকেন্দ্র ইয়েনান শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে জনসমাবেশের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। চীনের চতুর্দ্দিক থেকে সহস্র সহস্র যুবক-যুবতী ইয়েনানের জাপ-বিরোধী বিশ্ববিদ্যালয়ে, সামরিক ও রাজনৈতিক বিদ্যায়তনে শিক্ষা লাভ করবার জন্য ইয়েনানে এসে উপস্থিত হচ্ছে।

কমিউনিস্টদের প্রচারকার্য্যের ফলে চীনের সর্ব্বত্র গণতন্ত্রের প্রসারের জন্য এক নতুন জাগরণের স্বচনা হয়েছে। জনসাধারণের এই নতুন জাগরণ ওয়াংচিং-ওয়াই ও তার অনুচরবৃন্দ এবং কুয়োমিন্‌টাঙ-এর প্রগতি-পরিপন্থীদের সন্ত্রস্ত করে তোলে এবং কালবিলম্ব না করে তারা কমিউনিস্টদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করার জন্য অগ্রসর হ'লো। ১৯৩৮-এর ১৭ই জানুয়ারী কমিউনিস্টদের দৈনিক পত্রিকা "নিউ চায়না ডেইলী নিউজ" অফিস আক্রমণ ক'রে সব আসবাব ভেঙে ফেলা হয়; যারা সে-কাগজ বিক্রী করছিল তাদের কাছ থেকে পত্রিকা কেড়ে নিয়ে তাদের উপর দৈহিক অত্যাচার করা হয়। এর পরে কুয়োমিন্‌টাঙ-এর পত্রিকা-সমূহ কমিউনিস্ট ও তাদের পত্রিকা এবং অষ্টম রুট-বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আক্রমণ করে। একটি সম্পাদকীয় স্তম্ভে এ-ও পর্য্যন্ত ঘোষিত হয় যে, নাৎসী জার্মানী ই চীনের প্রকৃত বন্ধু এবং নাৎসী শাসন-ব্যবস্থানুযায়ী চীনে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা উচিত—কুয়োমিনটাঙ ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দলেরই চিন্তার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া সমীচীন নয়। অষ্টম রুট-বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, সামরিক কার্য্যের জন্য যে-অর্থ দেওয়া হয় তা কমিউনিস্ট সৈনাধ্যক্ষের রাজনৈতিক প্রচারে ব্যয় করে, প্রকৃতপক্ষে কোন যুদ্ধই তারা করে না। এই সকল অভিযোগের উত্তরে মাওৎসেতুঙ সম্মিলিত জাতীয় ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা ও তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করেন। অষ্টম রুট-বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ চু'তে যুদ্ধারম্ভ থেকে ছ'মাস পর্য্যন্ত অষ্টম রুট-বাহিনীর কার্য্যকলাপের এক ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন। ফলে জনসাধারণের সম্মুখে কুয়োমিনটাঙ-এর প্রগতি-পরিপন্থীদের, বিশেষ ক'রে ওয়াংচিংওয়াই-র অভিসন্ধি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে চিয়াংকাইসেক স্বয়ং কুয়োমিন্‌টাঙ-এর প্রগতি-পরিপন্থীদের কমিউনিস্ট-বিরোধী কার্য্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠেন, যুদ্ধজয়ের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির আন্তরিক সহযোগিতা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হবার কোন কারণ-ই তিনি খুঁজে পান নি, আর অষ্টম রুট-বাহিনী কি ভাবে জাপ-বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে কত অল্প সাহায্য তারা পাচ্ছে তা তাঁর চেয়ে ভালোভাবে কেউ

জানে না। তাই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোষণা করেছিলেন—"কমিউনিস্টরা কি ভাবে অর্থের ব্যবহার করছে তা নিয়ে গবেষণা করবার ইচ্ছা আমার নেই। অন্য বাহিনীকে আমি এর দশগুণ অর্থ সাহায্য করেছি, কিন্তু তারা অষ্টম-বাহিনী যে-সাফল্য অর্জ্জন করেছে তার এক ভগ্নাংশও করতে পারে নি।"

হ্যাঙ্কাউর পতনের পর ওয়াংচিঙ-ওয়াইর স্বরূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়ে এবং তিনি ও তাঁর অনুচরেরা চীন থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু কুয়োমিন্‌টাঙ-এ প্রগতি-পরিপন্থীদের প্রভাব অটুট থাকে। যুদ্ধের গতিধারায় ধীরে ধীরে চিয়াংকাইসেকও এই প্রগতি-পরিপন্থীদের খপ্পরে গিয়ে পড়েন। এদের প্রধান কথা হলো—রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কুয়োমিন্‌টাঙ-এর একনায়কত্বই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধীয় কোন নীতির পরিবর্ত্তন হবে না। কিন্তু কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করে যে, জাপ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে কৃষি-বিপ্লবের গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারসমূহকে একত্রিত করেই যুদ্ধ-জয় সম্ভব। উত্তর চীনে যে-সমস্ত জনপদ কমিউনিস্ট বাহিনী জাপ-সেনাদলের হাত থেকে উদ্ধার করেছে সে-সব অঞ্চলে তারা রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছে—কমিউনিস্টশাসিত প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টগুলিই তার প্রমাণ এবং এই প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টগুলিই কুয়োমিন্‌টাঙ-এর প্রগতি-পরিপন্থীদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করেছে। সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের সময় কমিউনিস্টরা জমিদারের জমি বাজেয়াফ্‌ত করার নীতি পরিত্যাগ করেছিল। যুদ্ধের গতিধারায়ও তারা এ-চুক্তি ভঙ্গ করে নি। কিন্তু জাপ-অধিকৃত অঞ্চল পুনরধিকার করে সেখানে তারা অনাবাদী জমির চাষের ব্যবস্থা করেছে, পলাতক জমিদার ও বিশ্বাস-ঘাতক জমিদারদের জমি জমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করেছে, ধনী কৃষকদের খাজনার হার গরীব কৃষকদের তুলনায় বেশী ধার্য্য করেছে। যে-অঞ্চলেই লালফৌজ প্রবেশ করেছে সেখানেই জমিহীন কৃষকেরা, গরীব ও মধ্যস্তরের কৃষকেরা উপকৃত হয়েছে এবং পলাতক ও বিশ্বাসঘাতক জমিদারদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। ফলে সেই সকল অঞ্চলের জনসাধারণ লালফৌজের যুদ্ধোদ্যমকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্ট শাসিত

অঞ্চলে কমিউনিস্টরা এ-ভাবে জন-প্রতিরোধের জন-দুর্গ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এ-গণজাগরণ কুয়োমিন্‌টাঙ-এর মনঃপূত হয় নি—জমিব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তনই তারা বে-আইনী মনে করে থাকে, কারণ কুয়োমিন্‌টাঙ দেশীয় বুর্জোয়া ও জমিদারদের-ই প্রতিভূ। তাই কুয়োমিন্‌টাঙ-এর প্রগতি-পরিপন্থী আমলাতান্ত্রিক ধুরন্ধরগণ কমিউনিস্ট বাহিনীর কার্য্য-কলাপের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করে। তাদের চিন্তাধারা ছিল এইরূপ: জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রকে পরাজিত করা কষ্টকর নয়, কিন্তু চীনে নব-জাগ্রত গণতান্ত্রিক প্রভাবকে কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখা দুঃসাধ্য। তাই কুয়োমিন্‌টাঙ-এর আমলাতান্ত্রিক কর্ণধারগণ সর্ব্বপ্রকার গণ-আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। শ্রমিক, কৃষক এবং ছাত্রদের নিজস্ব স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার অধিকারও অনেক স্থানে খর্ব্ব করা হয়েছে; এমন কি, শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে অনেক স্থানে জনগণের স্বাধীন প্রতিরোধ-সমিতিও গড়ে তুলতে দেওয়া হয় নি—জনসাধারণকে বাদ দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার সমস্ত ভার স্থানীয় কুয়োমিন্‌টাঙ-এর হাতে রাখা হয়েছে। স্থানীয় কুয়োমিন্‌টাঙ ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করবার চেষ্টা করেছে—জনসাধারণের সঙ্গে তাদের কোন সংস্পর্শই ছিল না। কিন্তু ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে ফাশিস্ট দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করা অসম্ভব। তাই তারা হটে এসেছে, কিন্তু পিছনে রেখে এসেছে নিরস্ত্র গ্রামবাসীকে। এই পরিত্যক্ত অঞ্চলেই কমিউনিস্ট বাহিনী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, জনগণকে তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ক'রে তাদের ভিতর প্রতিরোধশক্তি জাগিয়ে তুলেছে এবং তাদের সাহায্যেই সেই সকল অঞ্চল জাপানীদের কাছ থেকে পুনরধিকার করে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করেছে। কমিউনিস্ট বাহিনীর এই অগ্রগতিও কুয়োমিন্‌টাঙ-এর নেতৃবৃন্দ প্রীতির চক্ষে দেখেনি। যখন দেশব্যাপী আওয়াজ তোলা উচিত "জাপ-আক্রমণ প্রতিহত কর", তখন কুয়োমিনটাঙ-এর নেতারা আওয়াজ তুললো, "কমিউনিস্ট-শাসিত অঞ্চলে কুয়োমিনটাঙ-এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কর।" অবশ্য এ-কার্য্যে তারা বেশী দূর অগ্রসর হ'তে পারে নি,

কিন্তু সর্ব্বত্র কমিউনিস্টদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করবার জন্য তাদের প্রচেষ্টা দিন দিন তীব্রতর হ'তে থাকে। প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্ট শাসিত অঞ্চলে যাতে রণসম্ভার ও যন্ত্রপাতি পৌছতে না পারে তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হল; আর্থিক ক্ষেত্রে যাতে এই সকল অঞ্চল উন্নত না হ'তে পারে তার জন্য "শিল্পসমবায়ের" কোন সাহায্যই কমিউনিস্টদের দেওয়া হল না। অধিকন্তু কমিউনিস্টদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনষ্ট করবার জন্য "Blue shirts," "Regenerationists," "Three Principles Youth Brigades" প্রভৃতি গোপন সমিতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা হ'লো। এই সমিতিগুলির প্রধান কাজ হ'য়ে দাঁড়ালো—কমিউনিস্টদের ধ্বংস সাধন করা, যাতে দেশের ভিতর কমিউনিজ্‌মের প্রসার না হয় তার সুব্যবস্থা করা। এই সমিতিগুলির নেতাদের ভিতর "Regenerationist" নেতা জেনারেল হুংস্যুংমান-এর কার্য্যকলাপই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে পূর্ব্বতন সোভিয়েট অঞ্চলের পথঘাট পাহারা দিচ্ছেন; যখন চীনের যুবক-যুবতী ইয়েনানের শিক্ষা-কেন্দ্রে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ইয়েনানে প্রবেশ করবার চেষ্টা করে, তখন তাদের তিনি গ্রেফ্‌তার করে তার নিজস্ব সামরিক বিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। এই সামরিক বিদ্যালয়টি একটি বন্দিশালা ছাড়া আর কিছু নয়। এই সব সমিতির এজেণ্টরা অষ্টম রুট বাহিনীর সৈন্যদের ধরে দেবার জন্য নিম্নলিখিত হারে পুরস্কারও ঘোষণা করেছিল:—প্রথম শ্রেণীর সৈনিকদের জন্য ২০০ থেকে ৩০০ ডলার, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ১৫০ থেকে ২০০ ডলার, আর তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ৪০ থেকে ১০০ ডলার। ১৯৪০-এ কিয়াংশি প্রদেশে কুয়োমিন্‌টাং-এর সমরবাদীরা নতুন চতুর্থ বাহিনীর একটি অংশকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। ঐ বছরই কুয়োমিন্‌টাং-এর সৈন্যদল শেনসী-কানসু-নিংশিয়া প্রান্তীয় অঞ্চল আক্রমণ করে পাঁচজন কমিউনিস্টের শিরশ্ছেদ করে। এই সময়েই কুয়োমিন্‌টাং জেনারেল চু-হুই-পীংকে তেই-হ্যাং অঞ্চলে অবস্থিত অষ্টম রুট-বাহিনীকে আক্রমণ করবার আদেশ দেওয়া হয়। এই আক্রমণে বিমানবহর ব্যবহার করতেও কুয়োমিনটাং-এর অধিনায়কেরা দ্বিধা করে নি। অষ্টম রুট-বাহিনী শুধু

আত্মরক্ষার্থে কুয়োমিনটাঙ-এর অভিযানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য হয়। এ-ভাবে ১৯৪০-এ কুয়োমিন্টাঙ-এর কমিউনিস্ট-বিরোধী কার্য্য-কলাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু কমিউনিস্টরা এ-সব অত্যাচার সত্ত্বেও ধৈর্য্য হারায় নি, তারা সমস্ত ঘটনার তদন্তের জন্য এবং ন্যায় বিচারের জন্য চিয়াংকাইসেকের নিকট আবেদন করে। চিয়াংকাইসেক প্রথমে কোন সাড়া দেন নি; কিন্তু শত্রু যখন দেশের অভ্যন্তরে, তখন দেশরক্ষায় বীরযোদ্ধা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুয়োমিন্টাঙ-এর ঘৃণ্য অভিযানের ক্রমবর্দ্ধমান ঘটনাবলী দেশবাসীকে চঞ্চল করে তোলে এবং দেশবাসীর সে-চঞ্চলতা চিয়াংকাইসেককে সজাগ করলো। ১৯৪০-এর মাঝামাঝি তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে তিনি তদন্ত করে ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করবেন। ফলে সাময়িক ভাবে কুয়োমিন্টাঙ-এর কমিউনিস্ট-বিরোধী আন্দোলন বন্ধ হয় এবং কমিউনিস্ট বাহিনী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কিঞ্চিৎ সুবিধা পেতে থাকে। কিন্তু ১৯৪০-এর শেষের দিকে কুয়োমিন্টাঙ-এর প্রগতি-পরিপন্থীদের আধিপত্য চিয়াংকাইসেকের উপর এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে, চিয়াংকাইসেক তাদের-ই মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ান এবং তাঁর বক্তৃতা ও কার্য্যাবলীতে কমিউ-নিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাই পরিস্ফুট হয়ে উঠে। এ-জেহাদের প্রথম অভিব্যক্তি আমরা দেখি ১৯৪১-এর জানুয়ারীতে কমিউনিস্টদের নতুন চতুর্থ বাহিনীর উপর কুয়োমিন্টাঙ বাহিনীর আক্রমণে। ১৯৪০-এর ১৯-এ অক্টোবর কুয়োমিনটাঙ-অধিনায়ক হো-ইঙ-চিন এবং পাই-চুঙ-হাই এক টেলিগ্রাম মারফৎ কমিউনিস্ট সৈন্যাধক্ষ্য চু'তে, পেঙ-তে-হুই, ইয়ে-টিঙ এবং হ্যান-ইঙ-কে জানান যে, পীত নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত অষ্টম রুট-বাহিনীর ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর সমস্ত সৈন্যদলকে এক মাসের মধ্যে পীত নদীর উত্তর তীরে সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এর উত্তরে কমিউনিস্ট সৈন্যাধ্যক্ষরা জানান, "দক্ষিণ আনহুই-তে অবস্থিত সমস্ত কমিউনিস্টবাহিনীকে আদেশানুযায়ী সরিয়ে নিয়ে আসা হবে, কিন্তু অন্যান্য স্থানে অবস্থিত সৈন্যদলকে এখন সরিয়ে আনা অসম্ভব, কারণ বর্ত্তমানে ইয়াংশীর উত্তর তীরে আমাদের সৈন্যদল শত্রুবাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত;

অবস্থার একটু উন্নতি হলেই এই বাহিনীকেও সরিয়ে আনা হবে। কিন্তু এই আদেশানুযায়ী যখন কমিউনিস্টরা দক্ষিণ আনহুই-তে অবস্থিত তাদের ৯ হাজার সৈন্যকে উত্তরাভিমুখে সরিয়ে আনতে আরম্ভ করে, তখনই চিয়াংকাইসেক ১৯৪১-এর ৫ই জানুয়ারী এই বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবার আদেশ দেন, এবং কুয়োমিন্‌টাঙ বাহিনী কমিউনিস্টদের এই বাহিনীকে আক্রমণ ক'রে এর একটি অংশকে ধ্বংস করে। এর পর ১৭ই জানুয়ারী চিয়াংকাইসেক আর এক আদেশ জারী ক'রে নতুন চতুর্থ বাহিনীকে ভেঙ্গে দেন। চিয়াংকাইসেকের আদেশে কুয়োমিন্‌টাঙ বাহিনী নতুন চতুর্থ বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ ইয়ে-টিঙকে গ্রেফ্‌তার করে, সহঃসৈন্যাধক্ষ্য হ্যান-ইঙ-কে হত্যা করে এবং শত শত কমিউ-নিস্ট সৈন্যকে গ্রেফ্‌তার করে। এর পর থেকে দক্ষিণ ও মধ্য চীনের জাপ-বিরোধী ঘাঁটিতে অবস্থিত সমস্ত কমিউনিস্ট বাহিনীর উপরই কুয়োমিন্‌টাঙ বাহিনীর আক্রমণ আরম্ভ হয়।

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চিয়াং ও কুয়োমিন্‌টাঙ-এর জেহাদের দ্বিতীয় অভিব্যক্তি আমরা দেখি ১৯৪৩-এ। ঐ বছর মার্চ মাস থেকে এই জেহাদ চরম আকার ধারণ করে। চিয়াং-এর লিখিত "চীনের ভাগ্য" (China's Destiny) ১৯৪৩-এর প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয় (অবশ্য চীনের বর্ত্তমান রাজধানী চুংকিং-এর অধিবাসীদের ধারণা যে, এই বইখানা চিয়াং-এর লেখা নয়—এ-বই'র প্রকৃত লেখক হচ্ছেন তাও-সি চেঙ। ইনি হচ্ছেন ফাশিস্টদের সমর্থক এবং মিত্রশক্তির বিরুদ্ধবাদী ; আর নানকিং-এ জাপ-ছায়াশ্রিত গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্বাসঘাতক ওয়াং-চিং-ওয়াইর আদর্শের সঙ্গে এর যোগাযোগ বিদ্যমান)। কমিউনিজ্‌ম্ এবং উদারনৈতিক রাজনীতির বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গারণ এবং নবাকারে ফাশিস্ট শাসনব্যবস্থার সমর্থন-ই "চীনের ভাগ্য" গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই গ্রন্থের ২১৩ পৃষ্ঠার ভিতর মাত্র সাড়ে বারো পৃষ্ঠায় চীনের যুদ্ধসমস্যা ও যুদ্ধজয়ের জন্য কর্ত্তব্য কি তা আলোচিত হ'য়েছে, আর বাকী সমস্ত পৃষ্ঠায় দেখানো হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ চীনের শাসনব্যবস্থা ধনিক এক-নায়কত্বদ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত, চীনের স্বাধীনতা-আন্দোলনে কমিউনিস্টদের কোন

দাম নেই, বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা স্বাধীনতা-আন্দোলনে ক্ষতি ক'রেছে, কমিউনিস্টদের কর্ম্মপন্থা চীনের স্বাধীনতার পরিপন্থী। "চীনের ভাগ্য" প্রকাশিত হবার পরই আমরা দেখি কমিউনিস্ট-শাসিত অঞ্চলকে ধ্বংস করবার জন্য কুয়োমিন্‌টাঙ-সেনানায়কদের পরিকল্পনা। ১৯৪৩-এর গ্রীষ্মকালে কুয়োমিন্‌টাঙ-সেনানায়কেরা কমিউনিস্ট-শাসিত শেনসী-কাঙসু-নিঙশিয়া প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টকে অতর্কিতে আক্রমণ ক'রবার পরিকল্পনা করে। এই অভিযানকে সফল করার জন্য চিয়াং ৫ লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা সফল হতে পারে নি চারিটি কারণে:—প্রথমত, ১৯৪৩-এর জুন মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করে যে প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্ট এবং অষ্টম-রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর উপর যে-কোনরূপ আক্রমণকেই তারা প্রতিহত করবে। দ্বিতীয়ত, চীনের জনসাধারণ গৃহযুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করে এবং জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য তারা মত প্রকাশ করে। তৃতীয়ত, আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট কুয়োমিনটাঙকে জানিয়ে দেয় যে কুয়োমিনটাঙ-এর গৃহযুদ্ধের পরিকল্পনায় তাদের কোন সহানুভূতি নেই। চতুর্থত, সোভিয়েট এবং বিশ্বের জনমত চীনে গৃহযুদ্ধের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। ফলে কুয়োমিনটাঙ-এর এই সামরিক অভিযান সফল হ'তে পারে নি, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চিয়াং-এর কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান পুরোমাত্রায় চলতে থাকে। নতুন চতুর্থ বাহিনী দেশরক্ষার সংগ্রামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে; অষ্টম-রুট বাহিনী চীনকে বিভক্ত করতে চায়; কমিউনিস্টরা সম্মিলিত ফ্রণ্টের চুক্তি ভঙ্গ করেছে; জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধে তারা এগিয়ে আসছে না—প্রভৃতি প্রচারে চিয়াং মুখর হ'য়ে উঠেন। অন্যদিকে কুয়োমিনটাঙ-এর সৃষ্ট তথাকথিত গণ-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে আওয়াজ ওঠানো হয়—"কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে দাও", এবং "জনগণের জাতীয় রাজনৈতিক পরিষদে" কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করান হয়। জাপানকে আজও পরাস্ত না করতে পারার সমস্ত দোষ কমিউনিস্টদের উপর চাপানো হয়। ১৯৪৩-এর অক্টোবরে কুয়োমিনটাঙ-এর কার্য্যকরী সমিতিতে চিয়াং ঘোষণা করেন যে, কমিউনিস্টরা সম্মিলিত ফ্রণ্টের চুক্তি পালন করছে না। কিন্তু

ইতিহাস প্রমাণ করে যে, কমিউনিস্টরা-ই সম্মিলিত ফ্রণ্টের চুক্তি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছে। সম্মিলিত ফ্রণ্টের চুক্তি অনুযায়ী কমিউনিস্টরা শেনসী-কানসু-নিঙশিয়া প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টে এবং অন্যান্য জাপ-বিরোধী ঘাঁটিগুলিতে সান্-মিন নীতি অনুসরণ ক'রে চলেছে, কুয়োমিনটাঙ-গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ, দেশের সর্ব্বত্র সোভিয়েট শাসন প্রবর্ত্তন, এবং জমিদারের জমি বাজেয়াফ্ত করার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছে; যুদ্ধের প্রথম থেকেই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের নাম পরিবর্ত্তন ক'রে প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্ট করেছে; লালফৌজের নাম পরিবর্ত্তন ক'রে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের সামরিক পরিষদের দ্বারা পরিচালিত জাতীয়-বিপ্লবী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে তারই একটি অঙ্গ হিসাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

কিন্তু চিয়াং-ই সম্মিলিত ফ্রণ্টের চুক্তির শর্ত্ত পালন করেন্‌নি। প্রথমত, শর্ত্তে ছিল যে, লালফৌজ জাতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হ'লে পর কমিউনিস্ট বাহিনীগুলিকে অস্ত্রশস্ত্র, সমরসম্ভার ও অর্থ দিয়ে চিয়াং সাহায্য করবেন। প্রথম প্রথম চিয়াং কমিউনিস্ট বাহিনীগুলিকে অল্পস্বল্প অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু ১৯৩৯-এ কুয়োমিনটাঙে প্রগতি-পরিপন্থীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এ-সাহায্য বন্ধ হ'য়ে যায়; এবং তারপর থেকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টের চতুর্দ্দিকে পাঁচ লক্ষ কুয়োমিনটাঙ-সৈন্য মোতায়েন করা হয়—আর্থিক দিক দিয়ে প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টকে অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করাই এই সৈন্য মোতায়েনের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত, সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের সময় কমিউনিস্টরা প্রস্তাব ক'রেছিলু যে, জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রণনীতির জন্য একটি জাতীয় সমরপরিষদ গঠন করা হউক। চিয়াং তখন বলেছিলেন যে, বর্ত্তমানে এ সম্ভব নয়, তবে পরে একটি সমরপরিষদ গঠন করা হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিরোধের জন্য কোন সমরপরিষদ গঠিত হয় নি, এবং যখন-ই কমিউনিস্টরা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ বা সামরিক পরিকল্পনার কথা উত্থাপন করেছে তখনই তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে এবং পরিশেষে

কমিউনিস্টদের নতুন চতুর্থ বাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করার জন্য কুয়োমিনটাঙ-এর নেতারা সচেষ্ট হয়েছেন।

তৃতীয়ত সম্মিলিতফ্রন্ট-চুক্তির একটি প্রধান কথা ছিল চীনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কমিউনিস্টরা তাদের শাসিত অঞ্চলে সোভিয়েট শাসনব্যবস্থার পরিবর্ত্তে সান-মিন নীতি অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে। চিয়াং তখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কুয়োমিনটাঙ-এর সমস্ত প্রোগ্রামকে-ই তিনি গণতান্ত্রিক রূপ দেবেন, জনসাধারণের জাতীয় কংগ্রেস আহ্বান ক'রে দেশের শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক করবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও জনসাধারণের জাতীয় কংগ্রেস ডাকা হয় নি এবং ১৯৪৩-এর অক্টোবরে চিয়াং ঘোষণা করেন যে যুদ্ধ শেষ না হ'লে এ-কংগ্রেস ডাকা যাবে না। এর পরিবর্ত্তে চীন-সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে একটি তথাকথিত "জনসাধারণের রাজনৈতিক পরিষদ" স্থাপন করা হয়েছে এবং সে-পরিষদে কুয়োমিনটাঙ-এর প্রগতিপরিপন্থীদের-ই প্রাধান্য বিদ্যমান। অর্থাৎ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শর্ত্তকে চিয়াং চীন সাগরের জলে বিসর্জ্জন দিয়েছেন।

চতুর্থত, ১৯৩৮-এর "জাতীয় প্রতিরোধ ও পুনর্গঠন" পরিকল্পনায় যে আর্থিক ও সামরিক পরিবর্ত্তনের অঙ্গীকার কুয়োমিনটাঙ করেছিল তা-ও পালন করা হয় নি। এ-পরিকল্পনার মূল কথা ছিল জনসাধারণের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া, বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীদের "সামরিক আদালতে বিচার করা, প্রেস ও সভা সমিতির স্বাধীনতা দেওয়া, নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যসামগ্রীর দাম বেঁধে দেওয়া। কিন্তু এ-পরিকল্পনা কাগজে-পত্রেই রয়ে গেছে।

সুতরাং এ-কথা আজ সুস্পষ্টভাবে বলা চলে যে, সম্মিলিত ফ্রণ্টের শর্ত্ত কমিউনিস্টরা ভাঙ্গে নি, ভেঙ্গেছে কুয়োমিনটাঙ-এর কর্ণধারগণ। এ-কথা বলা অসঙ্গত নয় যে, কুয়োমিনটাঙ-এর নীতি আজ চীনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ও বিপদ-সঙ্কুল ক'রে তুলছে। চিয়াংকাইসেক আজ যে-নীতি অনুসরণ ক'রে চলেছেন, সে-নীতি হচ্ছে কুয়োমিনটাঙ-এর ফাশিস্ট মনোভাবাপন্ন প্রগতিপরিপন্থীদের নীতি। জাতীয় প্রতিরোধের জন্য ঐক্যের পথ থেকে চিয়াং আজ অনেক দূরে

সরে গিয়েছেন। গণতান্ত্রিক সামরিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক নীতি কার্য্যকরী করে চীনের চল্লিশ কোটি নর-নারীকে দেশরক্ষার কাজে উদ্বুদ্ধ করার আদর্শ চিয়াং পরিত্যাগ করেছেন। চীনদেশে আজ যা ঘটছে তা শুধু কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিন্‌টাঙ-এর মধ্যে, তুইটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে, শর্ত্তভঙ্গের সংঘর্ষ নয়—এ-সংঘর্ষ হচ্ছে গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে ফাশিস্ট মনোভাবাপন্ন শক্তির সংঘর্ষ; এক দলের উদ্দেশ্য চীনে ফাশিজ্‌মের ধ্বংস সাধন এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠা; আর এক দল জাগ্রত গণতান্ত্রিক শক্তির ভয়ে ভীত হ'য়ে নিজেদের প্রাধান্য অটুট রাখবার জন্য জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করতেও প্রস্তুত।

জাতীয় ঐক্যের পথে এই অন্তরায়ের জন্যে আজ চীন জাপানের বিরুদ্ধে তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে পারছে না। আজ যখন তুনিয়ার জনগণ ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে ফাশিস্টদের তুর্গ ভেঙ্গে চূরমার করবার জন্য তুর্ব্বার বেগে এগিয়ে যাচ্ছে বিজয়ের পথে, তখন চীনের যুদ্ধের কর্ণধার চিয়াংকাইসেকের অনুসৃত নীতির ফলে চীনে জাতীয়.ঐক্যের পথে অন্তরায় প্রবল হ'য়ে উঠছে। কিন্তু আশার কথা এই যে, এই প্রতিবিপ্লবী নীতির ফলেও চীনা কমিউনিস্টরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, জাতীয় ঐক্যের পতাকা তারা অনবমিত করেনি। তারা ঘোষণা করেছে যে, জাপানের কবল থেকে চীনকে রক্ষা করবার জন্য তারা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে। চীনের জাতীয় ঐক্যকে সংকটের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তারা যে-পথের নির্দ্দেশ করেছে তার মর্ম্মকথা হচ্ছে—(১) কুয়োমিন্‌টাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে-বিরোধ দেখা দিয়েছে, ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং রাজনৈতিক পদ্ধতিতে তার অবসান; (২) চীনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় "একটি পার্টি, একটি নীতি এবং একজন নেতা" এই ফাশিস্ট একনায়কত্বের অবসান ও প্রকৃত গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা; (৩) জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি স্থানীয় একটি "জাতীয় পরিষদ" গঠন। এবং এ-পথে শত বাধা-বিপত্তির ভিতরও কমিউনিস্টরা এগিয়ে চলেছে। চীনের জনগণের কাছে মাওৎসেতুঙ ঘোষণা করেছেন—"আমরা চাই প্রতিরোধ, সঙ্ঘবদ্ধতা এবং প্রগতির পতাকাতলে ঐক্য," এবং এই ঐক্যকে সুদৃঢ় করবার জন্য কমিউনিস্টরা তাদের কর্ম্মপন্থা দিয়ে চীনের সর্ব্বত্র প্রবল জনমত সৃষ্টি করে তুলছে।

তাই আজ এ-কথা বলা অসঙ্গত নয় যে, বিপ্লবী চীনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কমিউনিস্টদের উপর।